দ্বিতীয় অধ্যায়

ধিমাল লোকসংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য ও তার রূপরেখা

‘Folk-lore’ এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে ‘লোকসংস্কৃতি’ কথাটি বর্তমানে বহুল প্রচলিত। কিন্তু ‘Folk-lore’ এর দীর্ঘপথ পরিক্রমার পর 'Folkloristics' এর উদ্ভব বা সূচনা হয়। বাংলা লোকসংস্কৃতিরও বহুপথ পরিক্রমার পর বর্তমানে ‘লোকসংস্কৃতিবিদ্যা’ বা ‘লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞান’ নামে একটি স্বতন্ত্র আন্তর্বিদ্যামূলক শাখার উদ্ভব হয়েছে। সুতরাং Folk-lore থেকে Folkloristics যে কিছুটা স্বতন্ত্র তা উদ্ভব সময়ের ব্যবধানের মধ্যে থেকেই বোঝা যায়। Folk-lore কে অবলম্বন করেই Folkloristics এর উদ্ভব। তাই Folk-lore এর গোড়ার দিকে দৃষ্টি দেওয়া যেতে পারে— ‘Folklore’ এই কথাটির উদ্ভাবক হলেন উইলিয়াম জন থমস (William John Thoms)। তিনি ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে এ্যমব্রস মেরটন (Ambrose Merton) ছদ্মনামে ইংলন্ডের ‘এথেনিয়ম’ (Athenaeum) পত্রিকায় এই কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন। এই শব্দটি নির্বাচনের পূর্বে ইংলন্ডে লোকসংস্কৃতির বিষয়কে বোঝানোর জন্য ‘popular Antiquities’ ও ‘popular Literature’ শব্দ দুটি প্রচলিত ছিল। আর জার্মানিতে লোকসংস্কৃতির বিষয় বোঝানো হতো ‘ভোক্‌স্‌কুন্দে’ (Volkskunde) শব্দের দ্বারা।

জার্মান দেশ লোকসংস্কৃতি চর্চা ও সংগ্রহের কাজে অনেক বেশি উৎকর্ষতা দেখিয়েছিল প্রাথমিক পর্বে। তাই স্বাভাবিকভাবেই উইলিয়াম জন থম্‌স জার্মান দেশের ‘Volkskunde’ শব্দের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন যার ফলস্বরূপ তিনি জার্মান ‘Volk’ এর অনুসরণে ইংরেজি শব্দ নির্বাচন করলেন ‘Folk’। আবার যার সঙ্গে 'Lore' যুক্ত করে করলেন 'Folk-lore'। এই শব্দটির উদ্ভবের পাঁচ বছর পরে ১৯৫১ খ্রিস্টাব্দে Thomas Sternberg তাঁর গ্রন্থের শিরোনামে ‘Folklore’ কথাটি প্রথম ব্যবহার করলেন। তাঁর গ্রন্থটির নাম দিলেন ‘The Dialect and Folk-lore of Northamtonshire’।

তবে বর্তমানে লোকসংস্কৃতিবিদ্যা (Folkloristics) বলে যে শাখাটি পরিচিত তার উদ্ভব বলা যায় অ্যালান ডান্ডিসের (Alan Dundes) হাত ধরে। কারণ এর পূর্বে অষ্টাদশ শতকে জার্মানিতে Herder তাঁর বিখ্যাত লোকসংগীতের সংকলন ‘Stimmen der Vilker in Lidern’(1778-79) গ্রন্থ প্রকাশ করলেও সেখানে বর্তমান লোকসংস্কৃতিবিদ্যা বলতে যা বোঝায় তা ছিল না। পরবর্তীকালে জার্মান দেশের একই পরিবারের দুই ভাই (জ্যাকব লুড্‌উইগ

কার্লগ্রীম ও উইলহেল্‌ম কার্লগ্রীম) জাতীয়তাবোধের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে জার্মানির বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে কৃষকদের কাছ থেকে লোককথা সংগ্রহ করেন এবং ১৮১২-১৮১৫ সালের মধ্যে 'Kunder und Hansmarchen' নামে প্রকাশ করেন। গ্রীম ভাইদের এই চর্চা পদ্ধতিগতভাবে বিদ্যাচর্চার এই শৃঙ্খলাকে কিছুটা সংহত করলেও জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির কারণে বিভিন্ন সময়ে নানা প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছে। এরপর আস্তে আস্তে জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ লোকসংস্কৃতির বিষয়ের দিকে দৃষ্টি দিতে থাকে ; যার ফলস্বরূপ ১৮৩১ সালে ফিনল্যান্ডে গড়ে ওঠে 'ফিনিশ লিটারেরি সোসাইটি' (Finish Literary Society), ১৮৩৫ সালে আয়ারল্যান্ডে প্রতিষ্ঠিত হয় 'আইরিশ ফোকলোর কমিশন' (Irish Folklore Commission), ১৮৭৮ সালে 'ইংলিশ ফোকলোর সোসাইটি'। এরপর ১৮৮৮ সালে গঠিত হল 'অ্যামেরিকান ফোকলোর সোসাইটি' (American Folklore Society)। এই সমস্ত প্রতিষ্ঠানই হল জাতীয়তাবোধের ফল। প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে লোকসংস্কৃতির উপাদান সংগ্রহের কাজ দ্রুত ত্বরান্বিত হলেও লোকসংস্কৃতির উপাদানগুলির বিজ্ঞানভিত্তিক আলোচনার ধারণা এসেছে অনেক পরে। জাতীয়তাবাদী প্রেরণা থেকে সরে এসে ১৮৮৪-তে অ্যান্ড্রু ল্যাং (Andrew Lang) তাঁর 'Custom and Myth' গ্রন্থটিতে 'The Method of Folklore' প্রবন্ধে যথাযথভাবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লোকসংস্কৃতি চর্চার পদ্ধতিগত দিক সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। এরপর বিদ্যাচর্চার জগতে লোকসংস্কৃতির সীমানা নিয়েও লোকসংস্কৃতি বিদাদের মধ্যে নানা মতপার্থক্যের ঝড় উঠেছে কখনো 'Folk' কে নিয়ে আবার কখনো 'Lore' কে নিয়ে।

তবে বিশ শতকের প্রথম থেকেই কেউ কেউ উনিশ শতক পর্যন্ত চলে আসা ফোকলোরের গ্রামকেন্দ্রিক, ঐতিহ্যনির্ভর, নিরক্ষর জনসমষ্টি প্রভৃতির ধারণা থেকে সরে এসেছেন। এ প্রসঙ্গে মার্ক্সীয় তত্ত্বের আলোকে যারা লোকসংস্কৃতিকে দেখেছেন তাদের কথা বলা যেতে পারে। মার্ক্সবাদীরা লোকসংস্কৃতিকে একটি গতিশীল প্রক্রিয়া হিসেবে দেখেছেন। আর লোকসংস্কৃতি বলতে তারা শুধুমাত্র গ্রামীণ কৃষিজীবী ও তাদের সংস্কৃতি বোঝাননি, শহরের খেটে খাওয়া শ্রমিকদেরও তারা লোকের অন্তর্গত করেছেন ও তাদের সংস্কৃতিকে লোকসংস্কৃতি বলেছেন। মার্ক্সবাদীদের ধারণায় লোকসংস্কৃতি শুধুমাত্র ঐতিহ্যের ফসল নয় বর্তমান সময়েও তা তৈরি হয়ে চলেছে। কারণ লোকসংস্কৃতি শ্রেণি সংগ্রামের অংশ এবং হাতিয়ার। শ্রেণির বিভেদ যেখানে সেখানেই

লোকসংস্কৃতি নতুন নতুন উপাদান তৈরি হয়। ভ্লাদিমির প্রপ তাঁর 'থিওরি অ্যান্ড হিস্ট্রি অফ ফোকলোর' গ্রন্থেও বলেছেন যে প্রতিটি যুগ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে লোকসংস্কৃতিরও পরিবর্তন হয় ও নতুন লোকসংস্কৃতি তৈরি হয় এবং নতুনভাবে তাকে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়।

এরপর বিশ শতকের মধ্যভাগে পাশ্চাত্যে লোকসংস্কৃতি চর্চার জোয়ার আসে। ফলে পাশ্চাত্যের গবেষকরা নানা তত্ত্ব ও পদ্ধতির আলোকে লোকসংস্কৃতিকে ব্যাখ্যা করলেন। এতে লোকসংস্কৃতিকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গিতে আমূল পরিবর্তন ঘটল। ১৯৪৯ সালে মারিয়া লিচ সম্পাদিত গ্রন্থ 'Standard Dictionary of Folklore Mythology and Legend' এর বিভিন্ন প্রবন্ধে লোকসংস্কৃতিবিদ্‌গণ বহু তত্ত্বের আলোকে লোকসংস্কৃতিকে বিশ্লেষণ করে দেখালেন যে লোকসংস্কৃতির বিষয় ও তার চর্চা এক নয়। তারা লোকসংস্কৃতি চর্চাকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করলেন। এ প্রসঙ্গে আমেরিকার গবেষক চার্লস ফ্রান্সিস পটারের নাম বিশেষ স্মরণীয়। তবে তিনিও লোকসংস্কতির বিষয় ও চর্চাকে একই শব্দের দ্বারা বোঝানোর চেষ্টা করলেন—

> "The Word folklore is used both for the body of tradition and the science of studying it."[১]

কিন্তু অ্যালান ডান্ডিসই প্রথম সচেতনভাবে লোকসংস্কৃতির বিষয় ও লোকসংস্কৃতির চর্চাকে আলাদাভাবে বোঝানোর জন্য ১৯৬৫ সালে 'ফোকলোরিস্টিকস' শব্দটি ব্যবহার করলেন। তাঁর কথায়—

> "The materials and the study of them are both reffered to as folklore. To avoid this confusion it might be better to use the term folklore for the materials and the term folkloristics for the study of the materials."[২]

তাছাড়া পূর্ব প্রচলিত গ্রাম বা নগরকেন্দ্রিক 'লোক'-এর ধারণাও পাল্টে দিলেন অ্যালান ডান্ডিস। তাঁর মতে লোক হল একটি গোষ্ঠী বা বর্গ। যে গোষ্ঠীর সাধারণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে ন্যূনতম একটি উপাদানই তার মতে যথেষ্ট—

> 'The term 'folk' can refer to any group of people whats ever who share atleast one common factor.'[৩]

তাঁর মতে সাধারণভাবে যে কোন গোষ্ঠী পরিচিতির ক্ষেত্রেই দেখা যায় বহু মানুষ সেই গোষ্ঠীর সাধারণ বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করছে। তবে তাত্ত্বিকভাবে তাঁর মতে দু'জন মানুষের একটি গোষ্ঠী কল্পনা করা সম্ভব। এই গোষ্ঠীগুলির সদস্যরা একে অপরের পরিচিত নাও হতে পারে। শুধুমাত্র এদের মধ্যে একই ধরনের ঐতিহ্য বাহিত হতে হবে যা ঐ নির্দিষ্ট গোষ্ঠী ঐতিহ্য হিসেবে পরিচিত। এই ঐতিহ্যই তাদের মধ্যে এক ধরনের গোষ্ঠীগত বোধ তৈরি করবে। গোষ্ঠীর সাধারণ বৈশিষ্ট্য হিসেবে একই ধরনের পেশা, ভাষা, ধর্ম যে কোন কিছুই ভিত্তি হিসেবে কাজ করতে পারে। এমনকি একটি নির্দিষ্ট সময় পর্বের জন্যও এই গোষ্ঠী পরিচিতি তৈরি হতে পারে। এই ধরনের গোষ্ঠীর যে সংস্কৃতি তাকেই লোকসংস্কৃতি বলে চিহ্নিত করলেন অ্যালান ডান্ডিস। আমরাও আমাদের আলোচনায় অ্যালান ডান্ডিসের 'folkloristics' এর 'folk' এর ধারণাকে স্বীকার করে নিয়ে আলোচনায় অগ্রসর হয়েছি।

লোকসংস্কৃতিকে বিভিন্ন পণ্ডিতগণ বিভিন্ন ভাগে ভাগ করেছেন। ডক্টর মযহারুল ইসলাম তাঁর 'ফোকলোর পরিচিতি ও পঠন-পাঠন' গ্রন্থে লোকসংস্কৃতিকে চারটি ভাগে বিভক্ত করেছেন; যেমন—

১. লোকসাহিত্য

২. লোকাচার, বিশ্বাস এবং অনুষ্ঠান ইত্যাদি কেন্দ্রিক ফোকলোর

৩. লোক-শিল্প বা শিল্পগত ফোকলোর

৪. লোক-বিজ্ঞান এবং কারিগরি বিজ্ঞান[৪]

তবে পাশ্চাত্যের বেশিরভাগ পণ্ডিতগণ গঠন প্রকৃতি ও চারিত্র অনুসারে ফোকলোর তথা লোকসংস্কৃতিকে দুভাগে ভাগ করেছেন—

১. বস্তুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি (Material folklore)

২. অবস্তুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি (Non-material folklore)

আমরাও আমাদের আলোচনায় দুটি ভাগকেই গ্রহণ করেছি; যথা—

লোকসংস্কৃতি

১. বস্তুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি ২. অবস্তুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি

■ বস্তুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি :

যখন কোন জনগোষ্ঠী বা জাতি তার জীবিকা নির্বাহের এবং অবস্থার উন্নতির জন্য যে সমস্ত বস্তু নির্মাণ বা কলাকৌশল উদ্ভাবন করে সেই সমস্ত বস্তুই বস্তুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির অন্তর্গত। বস্তুকেন্দ্রিক বা উপাদান নির্ভর লোকসংস্কৃতি মূলত লোকসমাজের নিজস্ব মনন ভাবনায়, নিজস্ব হাতে তৈরি বস্তু সামগ্রী। অধ্যাপক নবীনচন্দ্র শর্মা material culture বা উপাদান নির্ভর লোকসংস্কৃতির পরিবর্তে 'ভৌতিক সংস্কৃতি' কথাটি ব্যবহার করেছেন। তিনি মনে করেন-

> "প্রাকৃতিক লোকজীবনকে সাধারণত ভৌতিক সংস্কৃতি (Material Culture) বলা যায়। যুগ যুগ ধরে প্রবহমান পরম্পরা এবং রক্ষণশীল ঐতিহ্যের অঙ্গীভূত সঠিক কলাকৌশল, পারদর্শিতা, পদ্ধতি ইত্যাদি সাধারণত ভৌতিক সংস্কৃতি। ভৌতিক সংস্কৃতির বিষয়বস্তু লোকসংস্কৃতির শ্রাবণিক (aunal) আচরণের উপর নির্ভর করে না, নির্ভর করে দৃশ্যগত বা চাক্ষুষ আচরণের উপরে। বাচিক কলার (verbal art) মতো ভৌতিক সংস্কৃতির মধ্যে রক্ষণশীল পরম্পরা (conserrative tradition) এবং ব্যক্তিগত পরিবর্তন— এই উভয় শক্তি নিয়ত থাকে। ফলে পরম্পরা আশ্রয়ী সমাজে (Tradition oriented society) পুরষ-স্ত্রী কীভাবে ঘর-দুয়ার নির্মাণ করে, কীভাবে কাপড় তৈরি করে অথবা খাদ্যদ্রব্য রান্না করে, কীভাবে কৃষিকাজ করে, মাছ পোষে, মাটি-পানির ব্যবস্থা করে, যন্ত্রপাতি নির্মাণ করে, সাজ-সরঞ্জাম বাসন-কোসন প্রস্তুত করে ইত্যাদির চর্চাই ভৌতিক সংস্কৃতির প্রধান উপজীব্য বিষয়।"[৫]

বস্তুকেন্দ্রিক বা উপাদান নির্ভর লোকসংস্কৃতিকে বেশ কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়—

অ. লোকখাদ্য ও লোকপানীয়

আ. লোকঔষধ

ই. লোকপরিচ্ছদ ও অলংকার

ঈ. লোক তৈজস

উ. লোক অস্ত্র

ঊ. লোকযন্ত্র

ঋ. লোকবাসগৃহ

অ. লোকখাদ্য ও লোকপানীয় :

মানুষের বেঁচে থাকার অন্যতম প্রধান শর্ত হল খাদ্য। বিজ্ঞানের পরিভাষায় মানুষের বেঁচে থাকার প্রাথমিক শর্ত হল জল, বায়ু, আলো ও খাদ্য। শিশু জন্মানোর পর থেকেই খাদ্যের প্রয়োজনের চাহিদাকে বোঝানোর জন্য বহু রকমের অভিব্যক্তি প্রকাশ করে থাকে। তাছাড়া মানুষের ক্রমাগত পুষ্টি, বৃদ্ধি, শারীরিক গঠন ও বিকাশের জন্যও খাদ্য অত্যাবশ্যক।

আদিম মানুষেরা প্রকৃতির কোল অর্থাৎ বনজঙ্গল থেকেই তাদের খাদ্য সংগ্রহ করত। বিভিন্ন পশুপাখির মাংস ও বনজ ফল-মূল ছিল তাদের প্রধান খাদ্য। কিন্তু এরপরে সভ্যতার বিবর্তনের পথেই তারা কৃষিকাজ করতে শিখল। ফলে কৃষি উৎপাদন ব্যবস্থায় বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন হওয়ায় নানা খাদ্যের সম্ভার চলে এল সমাজে। সাম্প্রতিক লোকসমাজ খাদ্যের বহুমাত্রিক সংযোজন ঘটালেও আমাদের মনে পূর্বশর্তের বিবর্তনের ধারা এখনও বহমান। তবে এ কথা ঠিক যে মানুষের খাদ্যাভাস গড়ে ওঠে পারিপার্শ্বিকতার ওপর নির্ভর করে। কারণ দেখা যায় যে অঞ্চলে যে সমস্ত বস্তুসামগ্রীর প্রাচুর্য রয়েছে সেই অঞ্চলের লোকসাধারণের মধ্যে সেই বস্তু সামগ্রীকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করার প্রবণতাও বেশি। কেননা যে কোন অঞ্চলের খাদ্যতালিকা নির্ভর করে থাকে সেই অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিবেশ ও উৎপাদন বৈচিত্র্যের উপর। উত্তরবঙ্গ মূলত অরণ্য-নদী-পাহাড় ও কৃষিকেন্দ্রিক অঞ্চল। এরূপ প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের পাশাপাশি বহু বিচিত্র জাতি, জনজাতির সমাবেশ ঘটেছে এই অঞ্চলে। তাই এই অঞ্চলের খাদ্য তালিকায় উঠে এসেছে নানারকম আঞ্চলিক খাদ্যসামগ্রী। যেমন শামুক, (গুগুলি) ঝিনুক বিভিন্ন ছোট জলজ ও স্থলজ প্রাণী। উত্তরবঙ্গের ধিমালদের মধ্যে প্রচলিত লোকখাদ্যের একটি তালিকা নীচে দেওয়া হল—

ধিমালদের মধ্যে প্রচলিত লোকখাদ্য ও লোকপানীয়

ক. শাকপাতা জাতীয় খাদ্য

১. ঢেঁকিয়া সার (ঢেঁকি শাক)
২. তেলথুয়া সার (বতুয়া/বেথুয়া শাক)
৩. লাফা সার (লাফা শাক)
৪. ইক্কা বিলাইতি (মিস্টি আলু পাতা ও বুনো আলু পাতা)
৫. লেউসার (কচুপাতা)
৬. মেনসে সার (সরষে শাক)
৭. গন্ধালী সার (গন্ধভাদাল পাতা)
৮. খুদিসার (ধিমালদের তৈরি নিজস্ব খাদ্য বিশেষ)

খ. আমিষ জাতীয় খাদ্য

১. শুট্‌কাহায়া (শুটকিমাছ)
২. সিদ্‌লা (সিদোল)
৩. হায়া (বিভিন্ন প্রকার মাছ)
৪. বেহা (মাংস)
৫. চুদুর সার (জলজ শামুক ও ঝিনুক দিয়ে তৈরি খাদ্য বিশেষ)

গ. শস্যজাতীয় খাদ্য

১. হোকা কুরুং (চাল ভাজা)
২. গেন্দ্রক (চালের তৈরি পিঠে বিশেষ)
৩. ডুমউম
৪. ঢেপ (শালুক)
৫. মাসকালাই সার (মাসকলাই ডাল)

ঘ. ফলমূল জাতীয় খাদ্য

১. ডামসে (কাঁঠাল)
২. তোরসে (আম)
৩. জামুনা (জাম)
৪. টেকর (টক ফল বিশেষ)
৫. লটকা (লটকো)
৬. কারাঙ্গা (কামরাঙ্গা)
৭. পুচলুত (টক জংলী ফল বিশেষ)
৮. গুয়াই (সুপারি)
৯. সন্তোরা (কমলালেবু)
১০. আওলা (আমলকি)
১১. চুখার (জংলী ফল বিশেষ)

ঙ. অন্যান্য খাদ্য

১. তামা সার (বাঁশের কোঁড়)
২. ইম্ফিকোমচকা, ইম্ফিকোসার (কলার মোচা ও কলা গাছের মাঝের সাদা অংশ)
৩. ইক্কা বিলাইতি সার
৪. ফেরং (সজনে ফুল)
৫. কুণ্ডুক (ব্যাঙের ছাতা মাসরুম)

চ. লোকপানীয়

ক. **শাকজাতীয় খাদ্য :**

উত্তরবঙ্গ মূলত কৃষিপ্রধান অঞ্চল। তাই কৃষি উৎপাদিত খাদ্যের সঙ্গে প্রাকৃতিক উৎপাদিত খাদ্যের চাহিদাও প্রচুর। বিশেষত জনজাতি, সম্প্রদায়ের খাদ্য প্রাকৃতিজ। সাম্প্রতিক আর্থিকভাবে সাবলম্বী হওয়ায় এই খাদ্যগুলির চাহিদা ক্রমশ কমে যাচ্ছে। তবে এখনও গ্রামীন এলাকায় এই খাদ্য সম্ভারের ব্যাপক প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। এবার ধিমালদের মধ্যে প্রচলিত শাকপাতা জাতীয় খাদ্যের পরিচয় দেওয়া হল—

●. *ঢেঁকিয়া সার (ঢেঁকি শাক)* : ধিমালদের খাদ্য তালিকার মধ্যে প্রচলিত এক বিশেষ শাক হল ঢেঁকি শাক। ধিমাল ভাষায় এই শাককে ঢেঁকিয়া সার বলা হয়। এই শাক সারা বছরই পাওয়া যায়। তাছাড়া বনে জঙ্গলে রাস্তার দু'পাশে মানুষের অযত্নেই বেড়ে ওঠে। ঢেঁকি শাক ধিমালরা সাধারণত ভাজা করেই খায়। আবার অনেক সময় এই শাকের সঙ্গে আলু মিশিয়েও ভাজা করে খেয়ে থাকে। ধিমালরা বিশ্বাস করে যে এই শাক খেলে শরীরে রক্ত ও দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পায়।

●. *তেলথুয়া সার (বতুয়া/বেথুয়া শাক)* : বতুয়া শাক ঘাস জাতীয় খাদ্য। বিশেষ একটি ঋতু অর্থাৎ শীতের সময়ই এই শাক উৎপন্ন হয়। সাধারণত হালকা ও ঝিরিঝিরি পাতাযুক্ত হয় এই শাক। কচি বতুয়া শাক সরষে তেলে ভেজে, জলে সেদ্ধ করে কিংবা বাটা করে ধিমালরা খায়। তাদের বিশ্বাস এই শাক খেলে রক্তে আয়রণের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। চোখের দৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধি পায়।

●. *লাফা সার (লাফা শাক)* : লাফা শাক মূলত শীতকালীন শাক। উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের মধ্যে এই শাক খাওয়ার প্রচলন সর্বাধিক। তারা এই শাককে ভেজে কিংবা বেগুনের সঙ্গে ঝোল করে কিংবা পেল্‌কা তৈরি করে খায়। ধিমালদেরও খাদ্য তালিকায় এই লাফা শাক বিশেষভাবে জায়গা করে নিয়েছে। এই শাককে তারা রাজবংশীদের মতোই তেল ছাড়া জলে সেদ্ধ করে ক্ষার মিশিয়ে পেলকা তৈরি করে খায়। এই শাক খেলে কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয় বলে তারা বিশ্বাস করে।

● *ইক্কা বিলাইতি (মিষ্টি আলু ও বুনো আলু পাতা)* : এই শাক ধিমালদের মধ্যে সর্বাধিক প্রচলিত। এই পাতাকে তারা ভেজে কিংবা তেল ছাড়াই সেদ্ধ করে খায়। এই পাতা খেলে শরীরে রক্ত বৃদ্ধি পায় বলে ধিমাল লোকেরা বিশ্বাস করে।

● *লেউ সার (কচু পাতা)* : কচু পাতাকেও শাক হিসেবে খাওয়ার প্রচলন আছে ধিমাল সমাজে। অনেক সময় ধিমালরা কচু পাতার সঙ্গে খাবার সোডা মিশিয়ে রান্না করে খায়। একে ধিমাল ভাষায় 'ছ্যাঁকা সার' বলা হয়। এই খাদ্য রক্ত পরিষ্কার করে বলে ধিমালরা বিশ্বাস করে।

● *মেনসে সার (সরষে শাক)* : ধিমালরা সরষে শাক খেতে খুবই পছন্দ করে। এই শাক ধিমাল ভাষায় 'মেনসে সার' নামে পরিচিত। কাঁচা সরষে পাতা তারা ভেজে তো খায়ই, তাছাড়া কচি পাতাকে ভেজে কিছুটা শুকিয়ে নিয়েও কলার পাতায় বায়ুরুদ্ধ করে বেঁধে মাটির তলায় ৬/৭ দিন রেখে দেয়। তারপর বের করে রোদ্রে শুকিয়ে গুন্দ্রুক তৈরি করে। এই গুন্দ্রুক ধিমালরা আলু দিয়ে রান্না করে খায়। ভাতের ফ্যান ঢেলে খেতেও ভালোবাসে। তাছাড়া গুন্দ্রুক ভেজে লঙ্কা সহযোগেও খায়।

● *গন্ধালী সার (গন্ধভাদালী পাতা)* : গন্ধভাদালী এক ধরনের লতানো উদ্ভিদ। এই গাছের পাতা উত্তরবঙ্গের প্রায় সমস্ত জাতি জনজাতি খাদ্য তালিকাতেই লক্ষ্য করা যায়। ধিমালরাও এই গাছের পাতা ছামের মধ্যে পিষে তারপর তেলে ভেজে বরা তৈরি করে খায়। ধিমালরা বিশ্বাস করে এই পাতার বরা খেলে খাবারের রুচি ও হজমশক্তি বাড়ে।

● *খুদিসার* : আতপ চালের খুদ ভিজিয়ে রেখে ডাল ছেড়ে দিয়ে ছাম গাইনে একত্র করে আটা তৈরি করে তাতে রসুন আদা কচি সজনে পাতা। মিশিয়ে ডাল দিয়ে সেদ্ধ করা হয় তাতে কালো কচুর কচি পাতাও মেশানো হয়। পরিমাণমত কাঁচা লঙ্কা বাটা, লবণ ও সোডা দেওয়া হয় (সোডা বানানো হয় সরষের শুকনো গাছ বা বিচি কলা গাছের মুড়ো কুচি কুচি কেটে শুকিয়ে পুরোনো হয় তার ছাই থেকে জল দিয়ে তার রস বের করা হয় বিশেষ পদ্ধতিতে সেই জল খাবার সোডা হিসাবে ধিমালরা ব্যবহার করে। শুধু তাই নয় এই সোডা কাপড় কাচার ক্ষেত্রেও ধিমালরা ব্যবহার করত। যখন সাবান, সার্ফ ছিল না।

খ. <u>আমিষ জাতীয় খাদ্য</u> :

উত্তরবঙ্গে বনভূমি, সমভূমির যেমন প্রাচুর্য রয়েছে তেমনি নদ-নদীরও প্রাচুর্য রয়েছে। তাই এখানকার বনভূমিতে যেমন ছোট বড় বন্য প্রাণী পাওয়া যায় তেমনি নদী-নালা-খাল-বিলগুলিতে বিভিন্ন ধরনের মাছ ও জলজ প্রাণী (কচ্ছপ, শামুক, ঝিনুক, কাঁকড়া) পাওয়া যায়। তাই ধিমালদের খাদ্য তালিকায় মাংসের পাশাপাশি বিভিন্ন জলজ ক্ষুদ্র প্রাণীও জায়গা করে নিয়েছে।

● *শুট্‌কা হায়া (শুটকি মাছ)* : শুটকি মাছ ধিমালদের অন্যতম প্রিয় খাদ্য। যেকোন শুটকিই তাদের কাছে প্রিয়। ধিমালরা শুটকি মাছকে শুট্‌কা হায়া বলে। বিশেষত তারা বর্ষার সময় যখন নদী-খাল-বিল জলে পরিপূর্ণ হয়ে যায় তখন তারা পর্যাপ্ত মাছ ধরে। এবং সেগুলিকে রোদে শুকিয়ে মাটির হাড়ির মধ্যে বালি দিয়ে তার মধ্যে শুটকি মাছকে পাতায় জড়িয়ে রেখে দেয় এবং সারা বছর ধরেই তারা শুটকি মাছকে ভেজে, পুড়িয়ে ও ঝোলে দিয়ে খায়। শুধু তাই নয় শুটকি দিয়ে তারা নানা ধরনের খাদ্য প্রস্তুত করে। বনজঙ্গলের অধিকার যখন ধিমালদের অবাধ ছিল তখন জঙ্গলের পশু শিকার করে ধিমালরা মাংস খেত। আর হরিণের মাংস রোদে শুকিয়ে শুটকি বানাত এই শুটকি ধিমালদের কাছে অতি প্রিয়।

● *সিদ্‌লা (সিদোল)* : সিদোল শুটকি মাছ দিয়ে তৈরি এক প্রকার খাদ্য বিশেষ। প্রথমে শুটকি মাছগুলিকে ভাল করে রোদে শুকিয়ে নেওয়া হয়। এর পর ছাম-গাইনে গুড়ো করা হয় আর তাতে মিশিয়ে দেওয়া হয় মান কচু কিংবা কালো কচুর ডাটি। শুটকির সেই গুঁড়ো বাঁশের চুঙ্গায় ঢুকিয়ে চুঙ্গার উপরিভাগে কলা পাতার আবরণ দিয়ে তার উপর কাদা মাটির প্রলেপ এমনভাবে দেওয়া হয় যাতে ভেতরে কোনমতেই বাতাস না ঢুকতে পারে। এভাবে রাখা শুটকি কিছুদিন পরে তা থেকে তীব্র গন্ধ বেরোয় এবং তা খাওয়ার উপযোগী হয়। এই সিদোল ধিমালরা শুধু নুন ও লঙ্কা দিয়ে রান্না করে খায়। আবার সরষে তেল ও লঙ্কা দিয়ে মেখে খাওয়ারও প্রচলন আছে।

● *হায়া (বিভিন্ন প্রকার মাছ)* : ধিমালরা সারা বছরই বিভিন্ন নদ-নদী-খাল-বিল-পুকুর থেকে বিভিন্ন ধরনের মাছ ধরে। যেমন মাগুর, দাড়িকা, পুঁটি, খলিসা, চ্যাং, সাটি, পয়া প্রভৃতি। এগুলিকে তারা ভেজে পুড়িয়ে কিংবা ঝোলের মধ্যেও খেয়ে থাকে।

● *বেহা (মাংস)* : ধিমালরা অত্যন্ত মাংস প্রিয় জনজাতি। তাই কুকুর, গরু, বাঘ, বাদে প্রায় সমস্ত শ্রেণির পশুপাখিই তাদের খাদ্য তালিকার অন্তর্ভূক্ত। তারা বন থেকে বিভিন্ন ধরনের প্রাণী সজারু, গোসাপ, খরগোশ, বেজি, ইঁদুর, হরিণ, কচ্ছপ শিকার করে আনে। তবে বর্তমানে শিকার করা মাংস পর্যাপ্ত না পাওয়ায় তারা মাংসের চাহিদা মেটাতে প্রতিটি ধিমাল পরিবারে শুয়োর মুরগি, হাঁস, কবুতর, ছাগল, ভেড়া পালন করে। তবে যেকোন মাংসই ধিমালদের পছন্দ হলেও শুয়োর, গোসাপ, পায়রা আর মুরগির মাংসই তাদের কাছে সর্বাধিক প্রিয়। তারা যেকোনো

মাংসকে পুড়িয়ে খায়। আবার সামান্য তেল, পিঁয়াজ, রসুন, আদা সহযোগে রান্না করেও খায়। মাংস রোদে শুকিয়ে বিশেষ পদ্ধতিতে সারা বছর ধরে ঘরে রেখে খাওয়ারও প্রচলন আছে ধিমালদের মধ্যে। ধিমালরা খুব অতিথিবৎসল। তাই পারিবারিক বা সামাজিক উৎসব পার্বণে অতিথি অভ্যাগতদের মাছ মাংস সহযোগে আপ্যায়িত করে আনন্দ অনুভব করে।

● *চুদুর সার (জলজ শামুক ও ঝিনুক দিয়ে তৈরি খাদ্য বিশেষ)* : ছোট ছোট জলজ শামুক (চুদুর) ও ঝিনুক (ঝিনাই) ও কাঁকড়া ভালো করে ধুয়ে জলে সেদ্ধ করা হয়। এরপর শামুক অথবা ঝিনুকগুলির ঢাকনা বা খোলস ফেলে দিয়ে মাথাগুলো কেটে সরষে তেল, নুন ও লঙ্কা দিয়ে ভেজে সেগুলিকে ডালের মধ্যে দিয়ে দেওয়া হয়। তারপর তা খাওয়া হয়। এই খাদ্য চুদুর সার নামে পরিচিত। এটি বর্তমানে উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের খাদ্য তালিকায়ও বিশেষ স্থান করে নিয়েছে। 'চুদুর সার' চোখের পক্ষে খুবই উপকারী। রাজবংশীদের মধ্যেও এই খাবারের প্রচলন আছে যাকে তারা হোরপা বলে।

গ. **শস্য জাতীয় খাদ্য :**

● *হোকা কুরুং, মকাই (চাল, ভুট্টা ভাজা)* : ধিমালরা চাল ও ভুট্টা ভাজা খেতে খুবই পছন্দ করে। ধিমালদের মধ্যে চা পানের প্রচলন না থাকায় তারা প্রতিদিন সকালে ও সন্ধ্যায় 'ইউ'-এর (ঘরে তৈরি মদ) সঙ্গে চাল ও ভুট্টা ভাজা খায়। আবার কখনো শুটকি মাছের সঙ্গে অথবা পেঁয়াজ, লঙ্কা ও নুন সহযোগে চাল ও ভুট্টা ভাজা খেয়ে থাকে। চাল ভেজে ঠাণ্ডা চাল ফেলে দিয়ে তাতে নুন লঙ্কা সহযোগে খেতে ভালোবাসে ধিমালরা। তাছাড়া ভাজা চাল গরম জলে আবার সিদ্ধ করে খায়। ধিমাল ভাষায় যাকে ফুসু বলে।

● *গেন্দ্রক (চালের তৈরি পিঠা বিশেষ)* : গেন্দ্রক এক ধরনের পিঠে। যা শুধুমাত্র ধিমালদের খাদ্য তালিকারই অন্তর্ভুক্ত। অন্য কোন জাতি, জনজাতির মধ্যে এই পিঠে লক্ষ করা যায় না। এই পিঠে ধিমালরা নিজস্ব জমিতে উৎপাদিত বরণী ধানের চালের সাহায্যে তৈরি করে। এই পিঠে তৈরি করার জন্য প্রথমে আতপ চালগুলিকে ছাম-গাইনে গুঁড়ো করে। তারপর সামান্য গরম জল দিয়ে মণ্ড তৈরি করে নেয় এবং সেগুলিকে পরিমাণ মতো ছোট ছোট আকারে ভাগ করে নিয়ে পেচেংলাভায় (এক ধরনের লম্বা পাতায়) মুড়ে কলাগাছের খোলের থেকে তোলা ফাতয়া দিয়ে বেঁধে গরম জলে সেদ্ধ করা হয়। আধ ঘণ্টাখানেক জ্বাল করার পর আঠালো মণ্ড

জমাট বেঁধে যায়। তারপর সেগুলিকে নামিয়ে পাতা থেকে বের করে সেগুলির সঙ্গে নুন ও লঙ্কা দিয়ে খাওয়া হয়। নবান্নের দিনে গেন্দ্রক খাওয়া ধিমালদের অবশ্য কর্তব্য। তাছাড়া বাসি গেন্দ্রক পুড়িয়ে খেতে ধিমালরা বেশ পছন্দ করে (চিত্র সংখ্যা : ৩)।

● *ডুম উম* : ধিমালদের খাদ্য ভাণ্ডারে পার্শ্ববর্তী সমাজের খাদ্যও বিশেষভাবে জায়গা করে নিয়েছে। যেমন ডিং এই খাদ্য শুধুমাত্র কোচ ও রাজবংশীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল কিন্তু বর্তমানে ধিমালদের মধ্যেও এই খাবারের ব্যাপক প্রচলন লক্ষ করায় যায়। রাজবংশীদের মধ্যে প্রচলিত ডিং ধিমালদের মধ্যে একটু পাল্টে হয়েছে ডুম উম। এই খাদ্য তৈরি করা হয় সাধারণত কাঁচা বাঁশের গিঁটের মধ্যে চাল ঢুকিয়ে উপরে মুখ বন্ধ করে দিয়ে খণ্ডের ভিতর রেখে খড় আগুন লাগিয়ে ডুম উম সেদ্ধ করা হয়। বাঁশের ভেতরের চাল বাঁশের আকৃতি নেয় এবং হলুদ হয়ে যায়। পরবর্তীতে বাঁশটিকে ফাটিয়ে ভেতরের সেদ্ধ চাল বের করে খাওয়া হয়।

● *ঢেপ (শালুক)* : ধিমালরা ঢেপের বীজ রোদে শুকিয়ে সেগুলিকে কড়াইয়ের মধ্যে বালুর সাহায্যে খইয়ের মতো করে ভেজে খায়।

● *মাসকালাই সার (মাসকলাই ডাল)* : ধিমালরা বহু পূর্ব থেকেই মাসকলাই-এর চাষ করত। এই মাসকলাই তারা বাড়িতে এনে রোদে শুকিয়ে নিজস্ব তৈরি জাতায় ভেঙে খোসা ছাড়িয়ে খাওয়ার উপযোগী করে তোলে। তাই ধিমালদের খাদ্যে বাঙালিদের মতোই ভাতের পাশে প্রায়শই ডাল খেতে দেখা যায়। শুধু ভাতের সঙ্গেই নয় ডাল ভাজা খেতেও দেখা যায়।

ঘ. ফলমূল জাতীয় খাদ্য :

ধিমালদের বাড়িতে আশেপাশে ও বনে জঙ্গলে বিভিন্ন ধরনের ফল *তোরসে (আম), জামুনা (জাম), ডামসে (কাঁঠাল), আঁখ (কুশিয়ার), লটকা (লটকনা), টেকর জংলি ফল (টক ফল বিশেষ), টাস (পেয়ারা), ইমফি (কলা), বাগুড়ি (কুল), চালিতা (চালতা), আওলা (আমলকি), সান্তরা (কমলা), ডুমার-আতা, কামরাঙ্গা, মিষ্টি লেবু* ইত্যাদি ফলের গাছ লক্ষ করা যায়। তাই স্বাভাবিকভাবেই ধিমালদের খাদ্য তালিকায় এই সমস্ত ফলগুলি জায়গা করে নিয়েছে। টক ফলগুলি রান্না করে খেতেও ভালোবাসে ধিমালরা। ধিমাল মেয়েরা বাঙালি মেয়েদের মতোই নুন লঙ্কা মেখে টক খায় মহানন্দে।

ঙ. <u>অন্যান্য খাদ্য</u> :

ধিমালদের মধ্যে শাকপাতা, ফলমূল, আমিষ জাতীয় খাদ্য ও শস্যজাতীয় খাদ্যের পাশাপাশি আরো কিছু খাদ্যের প্রচলন আছে; যেমন—

● *তামা সার (বাঁশের কোঁড়)* : বাঁশের কোঁড় ধিমাল সমাজে খাদ্য হিসেবে বিশেষভাবে প্রচলিত। জঙ্গলে বর্ষার শুরুতে বাঁশের নরম কোঁড় প্রচুর পরিমাণে গড়ে ওঠে। বাঁশের কোঁড় কেটে প্রথমে বাইরের খোলস ছাড়িয়ে নিয়ে ভেতরের শ্বাশালো সাদা অংশকে কুচি কুচি করে নির্দিষ্ট মাপে গোলাকার ভাবে কেটে গরম জলে সেদ্ধ করে তার সঙ্গে সিদোল কিংবা শুধু শুটকি মাছ দিয়ে রান্না করে খায়। তাছাড়া বাঁশের এই কচি অংশটি লম্বালম্বিভাবে কেটে বা গোল গোল করে কেটে মাটির কলসির ভিতরে অল্প জলে ডুবিয়ে কলসের মুখ খড় দিয়ে শক্ত করে বন্ধ করে দেওয়া হয়। বেশ কয়েকদিন রেখে তৈরি করে খায় ধিমালরা।

● *ইম্ফিকো মচকা, বা ইম্ফিকো সার (কলার মোচা ও ভাদাল)* : ধিমালদের মধ্যে কলার মোচা ও ভাদাল (কলা গাছের একেবারে ভেতরের সাদা অংশ) খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করার প্রচলন লক্ষ করা যায়। কলার মোচার লাল খোসাগুলি ছাড়িয়ে ভেতরের সাদা ঝুড়ি ঝুড়ি অংশগুলিকে বের করে তার ভেতরের হলুদ অংশটি ফেলে দিয়ে গরম জলে সেদ্ধ করে লঙ্কা ও নুন দিয়ে খাওয়ার প্রচলন আছে। আবার ভাদালগুলিকে ছোট ছোট করে গোল গোল করে কেটে গরম জলে সেদ্ধ করে তার সঙ্গে বনজ আলু দিয়ে রান্না করে খেতেও লক্ষ করা যায়। ধিমালরা বিশ্বাস করে যে এগুলি খেলে শরীরের রক্তচাপ বেশি থাকলে তা কমে যায় এবং খাবারে রুচি বাড়ে।

● *ইক্কা বিলাইতির সার (বনজ আলু)* : ধিমালরা দেশি আলু ছাড়াও মিষ্টি আলু ও বনজ আলু খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে থাকে। বনজ আলু তরাইয়ের বন জঙ্গলে আপনা-আপনি হয়। অনেক সময় ধিমালরা বনজ আলুর চারা বন থেকে সংগ্রহ করে এনে বাড়ির আশেপাশে লাগিয়ে দেয়। এগুলি যেমন পুষ্টিকর তেমনি সুস্বাদু।

● *ফেরং সার (বন সজনে)* : বন সজনের ফুল জলে সেদ্ধ করে লঙ্কা অল্প তেল দিয়ে মেখে খায় ধিমালরা। এতে তাদের বিশ্বাস খাদ্যে রুচি বাড়ে ও জ্বর জ্বর ভাব কেটে যায়।

● *কুণ্ডুক (ব্যাঙের ছাতা/মাসরুম)* : ধিমাল খাদ্য তালিকায় এক অন্যতম খাদ্য মাসরুম। যাকে ধিমালরা কুণ্ডুক বলে। ধিমালরা চাষের মাধ্যমে উৎপাদিত মাসরুমের থেকে প্রাকৃতিক

উপায়ে বনে জঙ্গলে পাওয়া মাসরুমকেই বেশি পছন্দ করে। সেগুলি তারা তেল মশলা সহযোগে মাংসের মতো রান্না করে খেয়ে থাকে।

তাছাড়া ধিমালদের খাদ্য তালিকায় অন্যান্য সব্জি যেমন আলু, বেগুন, টমেটো, লাউ, মিষ্টি কুমড়ো, ফুলকপি, বাঁধাকপি, পটোল, আদা, রসুন, হলুদ, সরষে, লঙ্কা, পেঁয়াজ, ভেন্ডি প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে রেখেছে। তবে একথা বলা যায় ধিমালরা চাষাবাদে অভ্যস্ত হয়ে ওঠার পর তাদের খাদ্য তালিকায়ও বিরাট পরিবর্তন এসেছে। তাছাড়া অন্যান্য সমাজের খাদ্যের তো প্রভাব রয়েছেই।

চ. **লোকপানীয় :**

সাধারণভাবে লোকপানীয় বলতে বোঝায় সংহত জনসমাজ যা যা পান করে তাই। এই অর্থে জলও লোকপানীয়। তবে আমরা কথাটিকে একটু নির্দিষ্ট ভাবে বলতে পারি, নির্দিষ্ট লোকসমাজ তাদের নেশার প্রয়োজনে যা যা পান করে তাই হল লোকপানীয়। তাই জল পান করা হলেও লোকপানীয়র অন্তর্ভুক্ত নয়। জল পৃথিবীর সমস্ত মানুষই বাঁচার প্রয়োজনে অর্থাৎ জৈবিক কারণে পান করে থাকে। তা লোক সমাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। অপরপক্ষে বিভিন্ন ধূমপানকেও লোকপানীয়র অন্তর্ভূক্ত করা হয়ে থাকে। যেগুলি নেশার প্রয়োজনেই নির্দিষ্ট লোকসমাজ গ্রহণ করে থাকে।

উত্তরবঙ্গের ধিমালদের মধ্যেও বিভিন্ন লোকপানীয়ের প্রচলন লক্ষ করা যায়। ধিমালরা শুধুমাত্র আমোদ-প্রমোদের জন্যই এগুলি পান করে না। ভৌগোলিক পরিবেশ ধর্মীয় ও সামাজিক কারণও রয়েছে এর পেছনে; যেমন—

উত্তরবঙ্গের আবহাওয়া তুলনামূলকভাবে অনেকটাই ঠাণ্ডা প্রকৃতির। ভূপ্রকৃতিও অনেকটা স্যাঁতসেঁতে ধরনের। তাই ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচার জন্যও উত্তবঙ্গের ধিমালরা ইউ (ঘরে তৈরি মদ) পান করে।

উত্তরবঙ্গের মাঠে-ঘাটে বিভিন্ন স্থানে খেজুর গাছ রয়েছে পর্যাপ্ত পরিমাণে যেখান থেকে অল্প পরিশ্রমেই অনেক খেজুরের রস পাওয়া যায় এবং যা থেকে খুব সহজেই তাড়ি তৈরি করা যায়। খেজুর গাছের সহজলভ্যতাও ধিমালদের তাড়ির মত লোকপানীয় গ্রহণ করার কারণ হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে।

ধিমালরা শ্রমজীবী মানুষ। তাই সারাদিনের কায়িক শ্রম দূর করতে তারা ইউ বা গোরা পান করে থাকে।

ধিমালরা ধর্মীয় কারণে অর্থাৎ পূজাপার্বণে দেবদেবীর উদ্দেশে যেমন পানীয় উৎসর্গ করে তেমনি আবার নিজেরাও পান করে থাকে।

ইউ ধিমালদের জীবনে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে অতিথি আপ্যায়নে ইউ না হলে অতিথির বিরাগভাজন হতে হয়।

তাছাড়া নিজস্ব জমিতে উৎপাদিত তামাকের সাহায্যে তারা ঘরে বিড়ি তৈরি করে ধূমপান করে থাকে।

● *ইউ (ঘরে তৈরি মদ)* : ধিমালদের বিভিন্ন লোকপানীয়ের মধ্যে একটি অন্যতম পানীয় হল ইউ। এগুলি তারা একেবারে নিজস্ব লৌকিক পন্থায় বাড়িতে তৈরি করে। প্রথমে আতপ চাল ও ভাউটিপাতা (এক ধরনের বনজ উদ্ভিদের পাতা) ছামগাইনের মধ্যে রেখে গুঁড়ো করে লাড্ডু তৈরি করে নেয়। এই লাড্ডুগুলিকে ধিমালরা মোচা বলে। তারপর কিছুদিন ছায়ার মধ্যে ঢেকে রেখে দেয় এবং এর উপর ছত্রাক পড়লে পরবর্তীতে ইউ-এর ফারমেনটেশনের জন্য ব্যবহার করে থাকে। ধিমালরা বিভিন্ন ধরনের উপকরণের সাহায্যে ইউ তৈরি করে থাকে। যেমন চাল, কলা, ভাত, মাংস, কাঁঠাল ইত্যাদি।

ধিমালরা খুদ বা ভাঙা চাল দিয়ে ভাত রান্না করে তার মধ্যে শুকনো ছত্রাক পড়া লাড্ডুগুলিকে ভেঙে গুঁড়ো করে ভাতের সঙ্গে মিশিয়ে দু'তিনদিন হাড়ি বা কলসির মধ্যে রেখে কলসি বা হাড়ির মুখ শুকনো খর দিয়ে বেঁধে রেখে দেয়। ফলে দু'তিন দিন পরে কলসির বা হাড়ির ভেতরে থাকা ভাত গেঁজে উঠলে সেগুলিকে ঝাকিয়ে ঝাকিয়ে বের করেও পান করে থাকে। এটি ধিমাল সমাজে গোরা নামে পরিচিত। ধিমালরা এই গোরা যেমন পান করে তেমনি আবার ইউও পান করে থাকে। ইউ তৈরির পদ্ধতি অনেকটা জটিল। তাই স্বাভাবিক ভাবেই বলা যেতে পারে ধিমালদের মধ্যে এই ইউ তৈরির প্রক্রিয়াটি অনেক পরে ঢুকেছে। সম্ভবত অন্য সংস্কৃতির প্রভাবে।

গোরা তৈরি হয়ে গেলে সেগুলিকে একটি বড় অ্যালুমিনিয়ামের পাত্রে রেখে ক্রমাগত আগুনে জ্বাল দেওয়া হয়। আর তার উপর পরপর দুটি পাত্র রাখা হয়। উপরের পাত্রে ঠাণ্ডা জল

ক্রমাগত ঢালা হয় আর মাঝের ছিদ্রযুক্ত পাত্রের ভেতরে ফানেল যুক্ত করা হয় যেটি বাইরের পাইপের সঙ্গে যুক্ত থাকে এবং যেটির মাধ্যমে তরল ইউ সংগ্রহ করা হয়।

নীচের জ্বালে বাস্প মাঝের ছিদ্র দিয়ে উপরে রাখা ঠাণ্ডা জলের সংস্পর্শে এসে তরলে পরিণত হয় এবং সেই তরল মাঝের পাত্রে রাখা ফানেলে জমা হয়ে পাইপের মধ্যে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়ে তখন তা বোতলে কিংবা কেটলিতে সংগ্রহ করা হয়। (চিত্র সংখ্যা : ৪)

● *তাড়ি* : ধিমালদের আর একটি উল্লেখযোগ্য লোকপানীয় হল তাড়ি। এই তাড়ি তৈরি করা হয় খেজুর গাছের রস দিয়ে। খেজুর গাছের রস সপ্তাহ খানেক মাটির কলসিতে সংগ্রহ করে কয়েক দিন রেখে তাড়িতে পরিণত করা হয়। খেজুরের তাড়ি তৈরি করা হয় শীত ঋতুতে। প্রধান পানীয় ইউ এর পাশাপাশি তাড়ি পানের বিশেষ প্রচলন আছে ধিমাল সমাজে।

উপরি উক্ত তরল পানীয় ছাড়াও ধিমালদের মধ্যে বিড়ি, ও হুকো পানের প্রচলন আছে। চুর বিড়ি তারা নিজস্ব জমিতে তৈরি তামাকপাতা রোদে শুকিয়ে কুচি কুচি করে কেটে ওর সঙ্গে লালি গুড় মিশিয়ে শালপাতায় মুড়ে তৈরি করে। আবার বিড়ির মতো তামাক পাতা কুচিকুচি করে কেটে সেগুলিকে সাদা কাগজের মধ্যে ঢুকিয়ে নিজস্ব পদ্ধতিতে তৈরি করে চুর। এছাড়া তামাক পাতার সঙ্গে চিটেগুড় মিশিয়ে কলকের মধ্যে ভরে হুঁকোর মাথায় লাগিয়ে পান করে। এই হুঁকো তৈরি করা হয় মূলত কাঠের দণ্ড ও নারকেলের মালাইয়ের সাহায্যে। নারকেলের মালাই-এর মধ্যে জল ঢুকিয়ে ও কলেকেতে তামাক দিয়ে এই হুকো পান করা হয়। ধিমালদের সামাজিক ও পারিবারিক অনুষ্ঠানে হুকোর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। বর বিয়ে করতে যাওয়ার সময় বরযাত্রীরা সঙ্গে দু'একটি হুঁকোও নিয়ে যায়।

আ. লোকঔষধ :

মানুষের সৃষ্টিলগ্নের পর থেকেই রোগ ব্যাধি, মৃত্যু এগুলি সমান্তরালভাবে মানব জীবনের সঙ্গে বয়ে চলেছে। আর মানুষও তার সীমিত বুদ্ধি দ্বারা জন্মলগ্ন থেকেই নিজস্ব চিকিৎসা পদ্ধতিতে রোগ ব্যাধি নিরাময়ের জন্য সচেষ্ট হয়েছে। আর এই চিকিৎসার উপকরণ হিসেবে তারা নানা প্রাকৃতিক উপাদান গাছ, কাণ্ড, লতা-পাতা, মূল নানা খনিজ ও প্রাণীকে পদার্থের সাহায্য গ্রহণ করেছেন। এইসব পদার্থই হল লোকঔষধ। ইংরেজিতে বলা হয় folk medicine ড. সঞ্জয় দে লোকঔষধ এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছেন—

> ‘‘দীর্ঘ অনুশীলনলব্ধ ব্যবহারিক জ্ঞানের মধ্যে দিয়ে গড়ে ওঠা কোনো প্রাচীন এবং গোষ্ঠীগত বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে প্রধানত গাছ-লতা-পাতা-কাণ্ড-শিকড় অথবা জীবজন্তুর দেহাংশ কিংবা খনিজ পদার্থ ইত্যাদি বিভিন্ন উপাদান এবং অলৌকিক গুণ সমন্বিত করা কোন সাধারণ বস্তু যখন শারীরিক বা মানসিক রোগের ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয় তখন তাকে লোকঔষধ রূপে চিহ্নিত করা যেতে পারে।’’[৬]

আবার ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী লোকঔষধ প্রসঙ্গে বলেছেন—

> ‘‘লোকসমাজ ঐতিহ্য পরম্পরায় প্রজন্মের পর প্রজন্ম যে ঔষধ ব্যবহারে অভ্যস্ত তাই হল লোকঔষধ।’’[৭]

বর্তমানে আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার অভাবনীয় উন্নতি ঘটলেও তার সুফল অনেকাংশে সমাজের উচ্চশ্রেণির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ভারতের মতো বিশাল জনসংখ্যার দেশে এখনো আধুনিক চিকিৎসার সুযোগ সমাজের সর্বস্তরে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়নি। মানুষের আর্থিক অসচ্ছলতা ও ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতাই এর জন্য অনেকাংশে দায়ী। সাধারণত বিজ্ঞান মনস্কতার অভাবে কিংবা পরম্পরাগত ঐতিহ্যের কারণে শিক্ষিত লোকেরাও আধুনিক চিকিৎসার পাশাপাশি লোকঔষধের প্রয়োগ করে থাকে। উত্তরবঙ্গে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এ অঞ্চলে কাজের সূত্রে বাইরে থেকে বহু লোকের সমাবেশ ঘটে। কিন্তু প্রয়োজনের তুলনায় আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার আজও অভাব রয়েছে। তাছাড়া উত্তরবঙ্গের ঘন অরণ্যে আজও বিভিন্ন প্রজাতির উদ্ভিদ লক্ষ করা যায় যেগুলির অধিকাংশই ভেষজ গুণ সম্পন্ন। তাই বাধ্য হয়েই এখানকার সমস্ত জাতি, জনজাতিগুলিকে রোগ নিরাময়ের জন্য লোকঔষধের উপর অনেকটাই নির্ভর করতে হয়। ধিমাল জনজাতিও এর ব্যতিক্রম নয়; তারাও বিভিন্ন ধরনের রোগের জন্য নানা লোকঔষধ ব্যবহার করে থাকে; যার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় নীচে তুলে ধরা হল—

	লোক ঔষধ	রোগের নাম
১)	কচি সরষে গাছ ফ্যারং (বনসজনে) বীজ	জ্বর
২)	থানকুনিপাতা, গোলমরিচ ছাগলের রক্ত	রক্ত আমাশা
৩)	বিচি কলাগাছের রস, ফ্যারং (বনসজনে) ফল লেবুপাতা, ডাকা (টকফল)	
৪)	কাঁচা দুধ, কালাকেশর রস, আতপ চাল	কৌষ্ঠকাঠিন্য
৫)	বনমারা (এক ধরণের জংলি গাছ) গাছের পাতা, গাঁদাফুলের পাতার রস, গোলমরিচ, রসুন, শ্যাওলা চুন, মাকলা বাঁশের উপরের সবুজ অংশ।	কেটেগেলে
৬)	তুলসী পাতা, রান্নাঘরের কালি, গো সাপের চামড়া, নিমপাতা, গন্ধক কাগজ	চুলকানি ও এলার্জি
৭)	কাচা ডিমের কুসুম, কাঁচা আলু, গোসাপের চামড়া, ভাজা কালি, বন পেঁয়াজ	আগুনে পোড়া
৮)	আতপ চাল, তুলসীপাতা, পিপলি ফল, আদা, গোলমরিচ, বাঁশের পাতার কুশি, বাসকপাতা, কালোজিরা, বনআদা, মেথি	সর্দি কাশি
৯)	পাকা কলা, জোনাকি, গেন্ধারী	রাতকানা
১০)	জ্যান্ত পয়ামাছ	চোখের ছানি
১১)	গুগলি, তুলসী পাতা	দৃষ্টিশক্তি কমেগেলে
১২)	প্রস্রাব, পেয়ারার কুশি	চোখ ওঠা
১৩)	খোকসাপাতা	কানপাকা
১৪)	বাঁশের শেকড়, আকন্দগাছের আঠা, পেয়ারা গাছের পাতা	দাঁতের ব্যথা
১৫)	তুতে	মাড়ি ফোলা ও মুখে দুর্গন্ধ
১৬)	গোলমরিচ, মানিমুণি গাছ, পদ্মফুল	জীভে ও মুখে ঘা
১৭)	বাউডালি গাছের পাতা, পায়রার বিষ্ঠা	ফোড়া
১৮)	হাড় জোড়া গাছ, জলজ শামুক, মুরগির ডিম	হাড়ভাঙা
১৯)	পায়রার বিষ্ঠা, গোমা গাছের পাতা, মাগুর মাছ, চিড়েভাজা	প্রসবের পর শরীর ব্যথা

	লোক ঔষধ	রোগের নাম
২০)	সাদা মিছরি	প্রস্রাবের জ্বালা
২১)	আতপচাল	শিশুদের বহুমূত্র
২২)	পেয়ারা পাতা, রসুনের রস	নাক দিয়ে রক্ত পড়া
২৩)	কৃষ্ণচূড়া ফলের রস, বনআদা, বনপেঁয়াজ, রসুন, গোলমরিচ	বাতের ব্যথা
২৪)	ব্যাঙ ভাজা তেল	হঠাৎ ফোলা
২৫)	কোডালা (জংলী ঝাড়) গাছের ছাল, ভীউটিপাতার রস, বনসজনে	জন্ডিস
২৬)	পাথরকুচি পাতা, তুলসীপাতা, বাদুরের মাংস	হাঁপানি
২৭)	আনারস পাতার রস, চিরতা	পেটেকৃমি হলে
২৮)	গন্ধক, কাগজের ছাই, চিনি, লবণ, নারকেল তেল	শিশুর মাথায় ঘা
২৯)	কুর্চিলা ফলের রস	কুকুরের কামড়ে
৩০)	কাঁচা ডিমের কুসুম	বিষপান করলে
৩১)	অর্জুন গাছের ছাল, কমলালেবুর রস	অরুচি
৩২)	পুঁইশাক	ঘুম না হলে
৩৩)	ঠাকুরী কলাই (মাসকলাই), নিমপাতা	বসন্ত রোগ
৩৪)	কচি তেজপাতা	ঘামাচি
৩৫)	গোসাপের চামড়া, তুলসীপাতা, নারিকেলের মালা পুড়িয়ে তার ছাই, ধূপের গুঁড়ো	দাঁদ ও ছুলি
৩৬)	কেন্নো, গোলমরিচ, নারকেল তেল	স্বরভঙ্গ
৩৭)	কদম ফুল, মোরগের মাথার ফুল, পাথরকুচিপাতা	মাথা ব্যথা
৩৮)	লোশিং শিং (শিমুল কাঁটা) এর কাঁটা বেটে লাগায়	ব্রণ হলে
৩৯)	মাস কলাই	আচিল
৪০)	টাপরাই (বনজ গাছ) গাছের শেকড় মাগুর মাছ, কালোজিড়া	সূতিকা
৪১)	চুন ও কাঁচা পেঁয়াজ	বিছা লাগলে
৪২)	আদা, তেলাকুচো পাতা	টাক পড়লে

	লোক ঔষধ	রোগের নাম
৪৩)	চিড়তা পাতা এবং কান্ড	মাথায় উকুন
৪৪)	কাঁচা হলুদ, চুন	হাত-পা মচকানো
৪৫)	লালি গু রাস ফুল (জবা ফুলের মতো লাল ফুল)	মাছের কাঁটা আটকে গেলে
৪৬)	বিচি কলার শেকড়, মহুয়া গাছের শেকড়, পানের শেকড়	গর্ভপাত
৪৭)	ছাগলের দুধ, গোলমরিচ	মাসিক দোষ
৪৮)	পাকা কালো জাম, হলুদ, চিড়তা	পায়খানা অনিয়মিত হলে
৪৯)	লবণ, চুন	জোঁক লাগলে
৫০)	কলমী শাক	স্তনদুগ্ধ বাড়াতে

ই. লোকপরিচ্ছদ ও অলংকার :

পরিচ্ছদ :

লোকপরিচ্ছদ হল লোকসমাজের পরিধেয় বস্ত্র সমূহ। লোকপরিচ্ছদের ধরণ অনেকটাই ভৌগোলিক পরিবেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। তাই গ্রীষ্মপ্রধান দেশের লোকপরিচ্ছদ শীত প্রধান দেশের পরিচ্ছদ থেকে ভিন্ন। আবার নাতিশীতোষ্ণ প্রধান দেশ সমূহের পরিচ্ছদ শীত ও গ্রীষ্মপ্রধান দেশ থেকে ভিন্ন। তাই দেখা যায় এই ভিন্নতার অনেকটাই প্রকৃতি দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। ধিমালদের পরিচ্ছদগুলিও তাই প্রকৃতি দ্বারা অনেকটা নিয়ন্ত্রিত।

ধিমাল পুরুষেরা তাদের ঐতিহ্যবাহী পরিচ্ছদ চৈতেধারী পরিধান করে। যা মোটা কাপড়ের হাতে বোনা বস্ত্র। কোমর থেকে হাটু পর্যন্ত অর্থাৎ শরীরের নিম্নাংশ ঢাকার পরিধান এটি। চৈতেধারী দেখতে অনেকটা গামছার মতো। এটি সাধারণত কালো রঙের হয় এবং মাঝখানে হলুদ বা লাল দাগ কাটা থাকে। শরীরের উপরের অংশের জন্য শার্ট ও তার উপরে আসকোট পরিধান করে। মাথায় তারা টুপি পরে। তাছাড়া ধিমাল বয়স্ক পুরুষদের মধ্যে লেংটি, গামছা, ধূতি, লুঙ্গি, প্যান্ট, শার্ট পরিধানের প্রচলন আছে। কম বয়স্ক ছেলেরা সাধারণত প্যান্ট শার্ট ও গেঞ্জি পরিধান করে। বর্তমানে ধিমালদের পোশাক পরিচ্ছদে তারা নিজস্ব ঐতিহ্য হারিয়ে পার্শ্ববর্তী বৃহৎ জনগোষ্ঠী বিশেষ করে বাঙালি, রাজবংশী ও নেপালীদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হচ্ছে। আর ধিমাল মহিলাদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক হল বোনা। এটি বুক থেকে হাটু

পর্যন্ত ঢাকার বস্ত্র। এটি কালো রঙের দেখতে এবং লম্বায় চার থেকে পাঁচ ফুট হয়। বোনা ধিমালরা বাড়িতে নিজস্ব তাঁত যন্ত্রের সাহায্যে তৈরি করে। কালো বোনার শেষ প্রান্তে লাল ও সাদা রঙের সূতো দিয়ে বর্ডার দেওয়া হয়। বোনাকে কোমরের সঙ্গে সেটে রাখার জন্য কাপড়ের ফিতের মতো দেখতে ছোট টুকরো ব্যবহার করে যা কোমর বন্ধনী নামে খ্যাত। বিভিন্ন নক্সা অনুযায়ী এগুলি ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন—

- ইটাংগী
- *পেটানে*
- *পাতালোই*
- *সামুঠী*
- *দা-বোনা*

তবে বর্তমানে ধিমাল মহিলারা পার্শ্ববর্তী বাঙালিদের দেখাদেখি শাড়ি ব্লাউজ, ব্রা পড়তে শুরু করেছে। কম বয়সী মেয়েরাও ফ্রক, স্কার্ট, প্যান্ট পড়তে শুরু করেছে।

অলংকার :

অন্যান্য লোকসমাজের মতো ধিমালরাও তাদের নান্দনিক দিককে গুরুত্ব দিয়ে থাকে। তাই আর্থিক অনটনের মধ্যে থাকলেও তারা তাদের রূপসজ্জায় কোনো খামতি রাখেনি। তাই নানা ধাতব অলংকারের পাশাপাশি প্রাকৃতিক উপাদানের সাহায্যেও তারা অলংকারের চাহিদা পূরণ করে।

তবে ধিমাল পুরুষদের মধ্যে রুপোর তৈরি আংটি ও ব্রেসলেট ছাড়া অন্য কোন অলংকার ব্যবহার করতে দেখা যায় না। তবে ধিমাল মহিলারা তাদের বাহ্যিক সৌন্দর্যকে বৃদ্ধি করার জন্য রুপোর তৈরি নানা ধরনের অলংকার ব্যবহার করে থাকে। ধিমাল মহিলাদের গলায় ব্যবহৃত অলংকারগুলি হল—

- *টাকা মালা*— এই মালা ধিমালরা আগে রুপোর কাঁচা টাকা দিয়ে তৈরি করত। বর্তমানে আর্থিক দুর্বলতার কারণে এই মালা তৈরি করা হয় ভারতীয় এক টাকার মুদ্রা দিয়ে। চেনের মধ্যে একটির পর একটি গেঁথে। আবার অনেক সময় পঞ্চাশ পয়সার মুদ্রাও ব্যবহার করতে দেখা যায় এই মালার মধ্যে।

● *চন্দ্রহার ও সূর্যহার*— চন্দ্রহার ও সূর্যহার তৈরি করা হয় প্রধানত রুপো দিয়ে। এর আকৃতি অনেকটা আধফালি চাঁদের মতো; তাই এর এরূপ নামকরণ হয়েছে। আবার অনেক সময় ছোট ছোট ফুলের চিত্র তুলে ধরা হয় এই হারের চতুর্দিকে।

● *নাদোই (কানোর সোনা)* : ধিমাল মহিলারা কানের দুল ব্যবহার করে। যাকে তারা বলে 'কানের সোনা' বা 'নাদোই'। এই দুল বিভিন্ন ধাতু দিয়ে তৈরি হয় কখনো সোনা আবার কখনো ভারতীয় কাঁচা টাকা। কানের উপরের অংশও তারা ঝোলানো টপ ব্যবহার করে থাকে যাকে তারা বলে খুন্টিলা।

● *সিদমন (সিঁথির সোনা)* : ধিমাল মহিলারা মাথায় সিঁথিতে পড়ে 'সিদমন' এটি প্রধানত সোনা দিয়েই তৈরি করা হয়। সাধারণত বিয়ের সময় কিংবা কোনো অনুষ্ঠানের সময় ধিমাল মহিলারা সিদমল পরে।

● *পোচিং (নাকের সোনা)* : নাকের জন্য তারা ব্যবহার করে নাকের ফুল যা ধিমাল সমাজে পোচিং নামে পরিচিত। এটি সাধারণত রুপোর তৈরি।

● *ঝুড়িখারু, কাকন এবং ঠ্যাংখারু* : হাতে তারা পড়ে 'ঝুড়িখারু' এবং বাহুতে পড়ে 'কাকন' এবং পায়ে পড়ে মল যা 'ঠ্যাংখুরু' নামে পরিচিত। তবে ঠ্যাংখারু পড়ার প্রচলন আজ প্রায় লুপ্ত। এগুলির বেশিরভাগই রুপোর তৈরি। এই নানাবিধ অলংকারগুলি ধিমালরা পরিধান করলেও ধিমালরা কেউ এগুলি নিজে তৈরি করে না। পার্শ্ববর্তী অন্যান্য সমাজের লোকেরাই এগুলি তৈরি করে; বিশেষ করে বাঙালি হিন্দু, রাজবংশী সমাজের স্বর্ণকারেরা।

ঈ. লোক তৈজস :

সাধারণভাবে লোক তৈজস বলতে বোঝায় প্রতিদিনের সাংসারিক প্রয়োজনে লোকসমাজ যেসব জিনিস ব্যবহার করে তাই। লোক সমাজের ব্যবহৃত লোক বাসনকোসনের মধ্যে দিয়ে সাংসারিক জীবনের নানা তুচ্ছ ঘটনা ও কৃষিকেন্দ্রিক জীবনাচরণের নানা ছবি ফুটে উঠতে দেখা যায়।

সভ্যতার ক্রমবিবর্তনের পথে মানুষ এক সময় তাদের খাদ্য সম্পদ সঞ্চয় করে রাখার জন্য মাটি, পাথর, গাছের গুঁড়ি দিয়ে ছোট বড় বিভিন্ন আকৃতির পাত্র তৈরি করেছে। আজও সেই ধারা

বয়ে চলেছে। সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে লোকসমাজ বিভিন্ন ধাতু দিয়ে নানা আকৃতির বাসন-কোসন তৈরি করে চলেছে। লোক জীবনে ব্যবহৃত বাসনপত্রকে তার উপাদনা অনুসারে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা যায়—

১. মাটির তৈরি বাসনপত্র
২. পাথরের তৈরি বাসনপত্র
৩. পেতল-কাঁসার তৈরি বাসনপত্র
৪. অন্যান্য ধাতু যথা লোহা, তামা, ব্রোঞ্জ ইত্যাদির তৈরি বাসনপত্র
৫. আধুনিক বিবিধ উপাদানের বাসনপত্র যথা- অ্যালুমিনিয়াম, স্টিল, কাঁচ, চীনা মাটির, প্লাস্টিক, ফাইবার ইত্যাদির তৈরি বাসনপত্র।

ধিমাল লোকসমাজও তাদের প্রতিদিনের জীবনে নানাবিধ বাসনপত্র ব্যবহার করে থাকে; যা নীচে আলোচনা করা হল—

১. মাটির তৈরি বাসনপত্র :

ধিমালরা তাদের দৈনন্দিন জীবনে বিভিন্ন ধরনের মাটির পাত্র ব্যবহার করে। এই মাটির পাত্রগুলি তারা যেমন পার্শ্ববর্তী অন্য সমাজের কাছ থেকে ক্রয় করে তেমনি আবার কিছু কিছু মাটির পাত্র তারা নিজেরাই নিজস্ব কৌশলে তৈরি করে। আর এই পাত্র তৈরির জন্য ধিমালরা উত্তরবঙ্গের উপর দিয়ে বয়ে চলা বিভিন্ন নদ-নদী (মেচি, মহানন্দা) থেকে এঁটেল মাটি সংগ্রহ করে আনে। ধিমালদের ব্যবহৃত মাটির পাত্রগুলি হল 'কলসি' যার সাহায্যে ধিমালরা বিভিন্ন নদ-নদী, জলাশয়, কুয়ো থেকে পানীয় জল সংগ্রহ করে এবং ঘরে সঞ্চয় করে রাখে। ভাত রান্না করার হাঁড়ি, মদ তৈরি করার জন্য বড় হাঁড়ির মতো পাত্র, শস্যদানা ভাজার জন্য মাটির তাওয়া রয়েছে। তাছাড়া তামাক খাওয়ার জন্য সিলিম, পূজা-পার্বণের জন্য মাটির তৈরি ঘট ও প্রদীপ ধিমালরা ব্যবহার করে। তাছাড়া তেল রাখার জন্য বিভিন্ন গোলাকৃতি পাত্রও ধিমালদের মধ্যে মাটির তৈরি।

২. পাথরের তৈরি বাসনপত্র :

সভ্যতার আদিম স্তরে মানুষ ছিল শিকারজীবী। তাই বন্য জন্তুকে শিকারের জন্য তারা যেমন পাথর কেটে ধারালো অস্ত্র নির্মাণ করত তেমনি আবার শিকার করা দ্রব্য রাখার জন্য

পাথরের তৈরি নানা পাত্র নির্মাণ করত। সভ্যতার আদিম স্তরের ধারা আজও পুরোপুরি বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। তাই অন্যান্য সমাজের মতো ধিমালরাও তাদের দৈনন্দিন জীবনে পাথরের তৈরি বিভিন্ন বাসনপত্র ব্যবহার করে থাকে। যেমন—

- *শিলনোড়া* : যেখানে ধিমালরা বিভিন্ন প্রকার মশলা, আদা, রসুন, পেঁয়াজ, লঙ্কা ও অন্যান্য দ্রব্য পিষে।

- *জাতা* : ধিমালরা বিভিন্ন প্রকার ডাল ভাঙে পাথরের তৈরি জাতার সাহায্যে।

কাপড় কাচার পিঁড়ি ও পা-দানি : ধিমালরা তাদের কাপড় কাঁচার জন্য ও সাময়িকভাবে কুয়ো কিংবা কলের পাড়ে রাখার জন্য পাথরের তৈরি চাই ব্যবহার করে থাকে।

৩. পেতল-কাঁসার তৈরি বাসনপত্র :

সমগ্র বাংলায় একসময় পেতল ও কাঁসার তৈরি বাসনপত্রের প্রাচুর্য লক্ষ করা যেত। ধিমালদের মধ্যেও পেতল ও কাঁসার তৈরি জিনিসপত্রের প্রচলন ছিল। বর্তমানে নানা আধুনিক বাসনপত্র তৈরি হওয়ায় এবং পেতল ও কাঁসার বাসনপত্র দুষ্প্রাপ্য এবং মূল্যবান হওয়ায় এর ব্যবহার অনেকটা কমে গেছে। তবে এই কাঁসার ও পেতলের বাসনপত্র ধিমাল সমাজ থেকে পুরোপুরি লুপ্ত হয়ে যায়নি। আজও প্রায় প্রত্যেক ধিমাল পরিবারে দু'একটি পেতল ও কাঁসার জিনিসপত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। যেমন—

- *জলা রাখার পাত্র*— কলসি, ঘড়া, বালতি, ঘটি, জগ ইত্যাদি।

- *রান্নার কাজে ব্যবহৃত পাত্র*— গামলা, খুন্তি, ডাবু ইত্যাদি।

- *খাবার বাসনপত্র*— থালা, গ্লাস, বাটি, চামচ ইত্যাদি।

- *পূজা-পার্বণের উপকরণ*— প্রদীপ, পুষ্পপত্র, ফুলদানি, রেকাব ইত্যাদি।

৪. অন্যান্য ধাতুর তৈরি বাসনপত্র :

ধিমালদের মধ্যে মাটি, পাথর ও কাঁসা পেতল নির্মিত বাসনপত্র ছাড়াও রান্নাঘরের কাজ থেকে শুরু করে গৃহস্থালির নানা কাজে লোহা, স্টিল, অ্যালুমিনিয়াম নির্মিত দা, কড়াই, কোদাল, বালতি, ঘটি, বাটি, সূচ ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।

৫. আধুনিক বিবিধ উপাদানে তৈরি বাসনপত্র :

উপরিউক্ত নানা উপাদানে তৈরি বাসনপত্র ছাড়াও বর্তমানে শহর থেকে প্রত্যন্ত গ্রাম পর্যন্ত ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে আছে ফাইবার, প্লাস্টিক, কাচ ও চীনা মাটির তৈরি দ্রব্য সামগ্রী। বিশেষ করে থালা, গ্লাস, বাটি, চামচ ইত্যাদি।

উ. লোক অস্ত্র :

মানুষ প্রাচীনকাল থেকেই বন্য জীব-জন্তু ও অন্যান্য শত্রুর হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য এবং শিকারের জন্য নানা ধরনের অস্ত্র ব্যবহার করে আসছে। বর্তমানে লোকসমাজ পুরোপুরি শিকারজীবী না হলেও শিকারের জন্য এবং আত্মরক্ষার জন্য নিজস্ব প্রযুক্তিতে কিছু অস্ত্র নির্মাণ করে যা লোকঅস্ত্র নামে পরিচিত। ধিমাল জনগোষ্ঠীর লোকেরাও কিছু লোকঅস্ত্রের ব্যবহার করে এবং যা তারা একান্ত নিজস্ব লৌকিক প্রযুক্তিতে তৈরি করে। ধিমালদের লোকঅস্ত্রগুলি হল—

- *খারধেনু (তির ধনুক)* : ধিমালরা বর্তমান পুরোপুরি কৃষিজীবী। তাই শিকারের উপর তাদের পুরোপুরি নির্ভর করতে হয় না। তা সত্ত্বেও ধিমালরা বছরের নির্দিষ্ট দিনে এই অস্ত্রের সাহায্যে বন্য জীবজন্তু শিকার করতে বের হয়। তির ও ধনুক তারা বাঁশের সাহায্যে তৈরি করে। এটি তৈরি করার জন্য দরকার হয় মাকলা বাঁশ। প্রথমে তারা বাঁশ কেটে চার ফুট দৈর্ঘ্য ও এক ইঞ্চি চওড়া একটি বাতা বের করে নেয়। তারপর তার সঙ্গে বাঁশের তিনফুট লম্বা একটি সরু গোল বাতা তৈরি করে। এরপর বড় বাতাটিকে দুপাশ থেকে বাঁকিয়ে ছোট গোলাকার বাতাটি তার সঙ্গে যুক্ত করা হয়। অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরা সাধারণত দড়ি কিংবা মোটা সূতো দিয়ে থাকে; কিন্তু ধিমালদের ধনুক এখানেই স্বতন্ত্র যে তারা কোনো সুতো কিংবা দড়ি ব্যবহার করে না। আর তির নির্মাণ করে তারা বাঁশের বাতা গোল করে কেটে তার মাথায় লোহার ফলা লাগিয়ে। তিরের মাথায় লোহার ফলায় তারা বিষাক্ত দ্রব্য লাগিয়ে দূর থেকে লক্ষ্য বস্তুকে আঘাত হানে।

- *গুলতাই (বাটুল)* : ধিমালদের একটি উল্লেখযোগ্য লোকঅস্ত্র হল বাটুল। যাকে ধিমালরা গুলতাই বলে। এটি মূলত গাছের শক্ত সরু ডাল দিয়ে তৈরি করা হয়। মূলত অর্জুন, পেয়ারা গাছের ডাল ব্যবহৃত হয় এই অস্ত্রটি নির্মাণ করতে। গাছের ডাল যেখানে দুটি শাখায় বিভক্ত হয়ে গেছে সেখান থেকে গিঁটযুক্ত ভি এর মতো আকৃতির এক ফুটের একটু কম অংশ কেটে নিয়ে তার মাথায় দুদিক থেকে টিউপ বা মোটা রাবার বেঁধে মাঝে ২ ইঞ্চি লম্বা ও চওড়া

চামড়ার সঙ্গে যুক্ত করা হয় এবং ছোট পাথর এই চামড়ার মাঝে বসিয়ে দু'আঙুলের দ্বারা পাথরসহ চামড়াটিকে পেছনের দিকে টেনে সামনে তিরের মতো লক্ষ্যবস্তুর দিকে ছোঁড়া হয়। পাথরের সজোর আঘাতে লক্ষ্যবস্তু ঘায়েল হয়ে পড়ে। (চিত্র সংখ্যা : ৫)

- *রাম গুলতাই (পাট দ্বারা তৈরি বাটুল বিশেষ)* : এটি পাট দিয়ে তৈরি। মাঝে শিকের মতো দেখতে। মাঝখানে পাথর ঢুকিয়ে ঝুলিয়ে জোড়ে ঘোরানো হয় এবং শেষে লক্ষ্য বস্তুর দিকে হানা হয়। এর সাহায্যে ধিমালরা পাখি শিকার করে থাকে।

- *শাবল* : এটি এটি সরল লোকঅস্ত্র। তিন থেকে পাঁচ ফুট দৈর্ঘ্য ও তিন ইঞ্চি প্রস্থ লোহার দণ্ডের একপ্রান্তে ধারালো করে এই অস্ত্র তৈরি করা হয়। এটি একদিকে যেমন লোকঅস্ত্র তেমনি আবার শিকারের যন্ত্রও বটে।

- *খাপড় (বল্লম)* : একটি ধিমাল জনজাতির একটি উল্লেখযোগ্য অস্ত্র। এই অস্ত্র সাধারণত লম্বায় পাঁচ থেকে ছয় ফুট মাকলা বাঁশ কিংবা শক্ত গাছের সোজা ডালের মাথায় লোহার ত্রিকোণ ফলা লাগিয়ে তৈরি করা হয়। দূর থেকে ছুঁড়ে শত্রু কিংবা লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত হানা হয়।

- *ডাবিয়া (ছোট ছোরা)* : এই লোক অস্ত্রটি নেপালীদের প্রভাবে ধিমালদের মধ্যে সহজেই স্থান করে নিয়েছে। বর্তমানে খুরপী নামক এই লোক অস্ত্রটি ধিমালদের প্রায় প্রত্যেকটি বাড়িতেই লক্ষ করা যায়।

- *সিকল (দা)* : দা অন্যান্য লোক সমাজের মতো ধিমালদেরও একটি অন্যতম লোকঅস্ত্র। এটি লোহা দিয়ে তৈরি করা হয়। এর হাতল বাঁশ কিংবা কাঠ দিয়ে তৈরি করা হয়।

- *পেনাইঠি (লাঠি)* : ধিমাল লোকসামাজের একটি উল্লেখযোগ্য লোকঅস্ত্র হল লাঠি। এই লাঠি তারা মাঁকলা বাঁশের গোড়ার অংশ ভালো করে ছেঁটে নিয়ে জলে ভিজিয়ে তারপর রোদে শুকিয়ে তৈরি করে থাকে। তাছাড়া কখনো কখনো গাছের শক্ত ডাল দিয়েও তারা লাঠি তৈরি করে থাকে। তরাই অঞ্চলে প্রচুর বাঁশ এবং বনভূমির প্রাধান্য থাকায় অন্যান্য লোকসমাজের মতো প্রতিটি ধিমাল পরিবারেই লোকঅস্ত্র হিসেবে লাঠির ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

ঊ. লোকযন্ত্র (Folk tools) :

লোকযন্ত্র সাধারণত লোকসমাজের দ্বারা সৃষ্ট যন্ত্রসমূহ। বর্তমান যান্ত্রিকতার যুগে কলকারখানায় নির্মিত যন্ত্রসমূহ শহর-গ্রাম ছেয়ে ফেললেও লোকসমাজ তার বাইরে নিজস্ব লৌকিক প্রযুক্তির দ্বারা দৈনন্দিন কাজের জন্য ও মনোরঞ্জনের জন্য কিছু যন্ত্র তৈরি করে থাকে যা লোকযন্ত্র নামে পরিচিত। লোকযন্ত্রের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ড. বরুণকুমার চক্রবর্তী তাঁর 'লোকসংস্কৃতি ও নৃবিদ্যার অভিধান' গ্রন্থে বলেছেন—

> "লোকসমাজ দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় কার্যাবলী সম্পন্ন করার জন্য যেসব যন্ত্রাদি ব্যবহার করে, সেগুলিই লোকযন্ত্র।"[৮]

ধিমালদের ব্যবহৃত লোকযন্ত্রগুলিকে নিম্নলিখিত ছকের সাহায্যে দেখানো যেতে পারে—

লোকযন্ত্র

- ক. সাধারণ গৃহকর্ম নির্ভর লোকযন্ত্র
- খ. কৃষিকর্ম নির্ভর লোকযন্ত্র
- গ. শিকার নির্ভর লোকযন্ত্র
- ঘ. মনোরঞ্জন নির্ভর লোকযন্ত্র

ক. সাধারণ গৃহকর্ম নির্ভর লোকযন্ত্র :

● *সিকল (দা)* : এই লোকযন্ত্রটি যেকোন লোকসমাজের প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই লক্ষ করা যায়। লোকগৃহ নির্মাণের জন্য প্রত্যেক মুহূর্তে এর প্রয়োজন হয়। তাছাড়া বাড়ির আশেপাশে গাছের ডালপালা ছাটতে সিকল এর বিশেষ ভূমিকা রয়েছে।

● *খোন্তা (খুন্তি)* : এই লোকযন্ত্রটি ধিমালরা গৃহ নির্মাণের সময় বিশেষ করে ঘরের খুঁটি বসানোর জন্য মাটি খুঁড়তে ব্যবহার করে থাকে। এটি তৈরি করা হয় বাঁশের কিংবা কাঠের তিন চার ফুটের মতো লম্বা শক্ত লাঠির নীচে লোহার কিংবা টিনের পাত গোলাকার ভাবে লাগিয়ে।

● *দুফে (কুড়ুল)* : এই লোকযন্ত্রটির সাহায্যে ধিমালরা গাছ ফালি করে জ্বালানির জন্য লাকড়ি তৈরি করে।

● *আড়ি (কড়াত)* : এই লোকযন্ত্রটির দ্বারা ধিমালরা গাছ চেড়াই করে।

● *বাসিলা* : এই লোকযন্ত্রটির দ্বারা ধিমালরা বিভিন্ন গৃহের কাজ ও শিকারের জন্য সরঞ্জাম তৈরি করে।

● *শাবল* : এই লোকযন্ত্রটি বাড়ির বিভিন্ন কাজে বিশেষ করে শক্ত জায়গায় গর্ত খুঁড়তে এবং গাছের শেকড় তোলার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এটি তৈরি করা হয় মোটা লোহার রডকে কামারের দ্বারা পিটিয়ে একপাশে চ্যাপ্টা ও ধারালো করে। এটি আয়তনে ৩-৪ ফুট লম্বা হয়ে থাকে।

খ. কৃষিকর্ম নির্ভর লোকযন্ত্র :

বিশ্বের প্রায় সব দেশের লোকসমাজই কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল। বর্তমানে কৃষির উপর ভিত্তি করে অনেক আধুনিক যন্ত্র ট্রাক্টর, পাওয়ারটিলার তৈরি করা হলেও আজও দরিদ্র দেশগুলিতে কৃষিকাজের জন্য হাতে তৈরি নানা যন্ত্র ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশেও কৃষিকাজের জন্য কৃষকেরা নানা লোকযন্ত্র ব্যবহার করে থাকে। সেইসূত্রে ভারতীয় ধিমালরাও তাদের কৃষিকাজের জন্য বিভিন্ন কৃষিযন্ত্র ব্যবহার করে। যেমন—

● *হালে (লাঙল)* : কৃষিকাজে ব্যবহৃত অতিগুরুত্বপূর্ণ লোকযন্ত্র হল লাঙল। লাঙল তৈরির জন্য প্রাকৃতিজ ও অপ্রাকৃতিজ দু ধরনের উপকরণেরই প্রয়োজন হয়। একটি লাঙল আবার কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের সমষ্টি। যেমন লাঙলের মাথার দিকে থাকে একটি লোহার পাত যা 'ফলা' বা 'ফাল' নামে পরিচিত। এই ফালটি নিচে কাঠের সঙ্গে দুটি লোহার কাঠি দ্বারা শক্ত করে আটকানো থাকে। এর বিপরীত প্রান্তে উপরের দিকে থাকে একটি হাতল যা বাঁশ বা কাঠ দিয়ে তৈরি করা হয়। এর শেষপ্রান্তে যেখানে হাত দিয়ে লাঙল চেপে ধরা হয় তাকে 'মুঠা' বলা হয়। নীচে ফালের একটু উপরে একটি ছয়-সাত ফুট লম্বা কাঠের বা বাঁশের দণ্ড লাগানো থাকে যা 'ঈশ' নামে পরিচিত। এই ঈশ গরুর কাঁধে লাগানো জোঙ্গাল বা জোয়ালের মধ্যবর্তীস্থানে রশি দিয়ে আটকে দেওয়া হয়। ঈশের সঙ্গে জোয়ালকে রশি দিয়ে আটকাতে ঈশের গায়ে কয়েকটি খাঁজ কাটা থাকে যাকে 'আমেরা' বলা হয়। আবার ঈশের অপরপ্রান্ত লাঙলের সাথে যেখানে জোড়া দেওয়া হয় সেখানে বাইরের পাশে ও ভেতরের পাশে কাঠের কতকগুলি ছোট ছোট টুকরো ঢুকিয়ে দেওয়া হয় যা 'পটাশ' নামে পরিচিত। লাঙল বাঁধার প্রকৃতি অনুসারে চাষের নামকরণ করা হয়; যেমন— বাহি চাষ, স্যাও চাষ ইত্যাদি। (চিত্র সংখ্যা ঞ্জ ৬ ক)

● *জঙ্গাল (জোয়াল)* : চাষের কাজে ব্যবহৃত লাঙলের মত আর একটি উল্লেখযোগ্য লোকযন্ত্র হল জোয়াল। এটি সাধারণত বাঁশ দিয়ে তৈরি করা হয়। আবার কোন কোন সময় কাঠ

দিয়েও তৈরি করা হয়ে থাকে। এটি লম্বায় চার থেকে পাঁচ ফুট হয়। এর দুপাশে বাঁশের তৈরি দুটি এক থেকে দেড় ফুট লম্বা খাঁজ কাটা কাঠি এপাশ থেকে ওপাশ ঢোকানো থাকে। এই কাঠিটিকে বলে 'সুলটি'। সুলটির সাথে যে সরু দড়ি থাকে যা দিয়ে গরুর গলায় বাঁধা হয় তার নাম 'জুড়ান্তি' বা গালানচি। জোয়ালের মধ্যবর্তী স্থানে লাঙলের সঙ্গে জোয়ালের সংযোগ রাখতে একটি মোটা দড়ি থাকে যাকে বলা হয় নেঙ্গেরা। (চিত্র সংখ্যা : ৬ ক)

● *পেনাইঠি (পেন্টি বা নড়ি বা লাঠি)* : গরু দিয়ে চাষ করার সময় অবাধ্য গরুকে ঠিক মতো চালনা করার জন্য প্রয়োজন হয় একটি পেন্টি বা লাঠি। পেন্টি তৈরি করা হয় সাধারণত বাঁশের কঞ্চি কিংবা বাতা দিয়ে। এটি লম্বায় সাধারণত আড়াই থেকে সারে তিন ফুটের মতো হয়।

● *মই ও ডোর (মই ও দড়ি)* : লাঙল দ্বারা জমি চাষ করার পর জমি সমান করার জন্য এবং মাটির ঢিল ভাঙার জন্য একটি অপরিহার্য কৃষিযন্ত্র হল মই। এই যন্ত্রটি আয়তনে পাঁচ/ছয় ফুট হয়ে থাকে। পাঁচ ছয় ফুট লম্বা বাঁশটিকে ভালো করে ছেঁটে নিয়ে মাঝখান বরাবর ফালি করা হয়। তারপর দুই ফালিকে মাঝে প্রায় এক ফুট ফাক রেখে সমান্তরালভাবে সিঁড়ির মতো করে বাঁশের মোটা বাতা দ্বারা যুক্ত করা হয় যা 'উয়া' বা 'খোয়া' নামে পরিচিত। মই এর দুপাশ থেকে দুটো লম্বা দড়ি থাকে যা সামনের দিকে গরুর কাঁধে থাকা জোয়ালের মাঝখানে বাঁধা হয় এটি 'ডোর' নামে পরিচিত। (চিত্র সংখ্যা : ৬ ক)

● *খুই দাড় (বেদা/বেধা)* : কৃষি নির্ভর যন্ত্রের মধ্যে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্র হল খুই দাড়। কৃষি জমি থেকে আবর্জনা পরিষ্কার করবার জন্য এটি ব্যবহার করা হয়। বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে ভাদই ধান ও পাট বোনার আগে ও পরে ক্ষুদ্র আগাছা পরিষ্কার করতে ও মাটি আলগা করতে এই যন্ত্রটির দ্বারা জমিতে টানা হয়। আকৃতি ও প্রকৃতি অনুযায়ী এটিকে দুইভাগে ভাগ করা হয়; যথা— হাতে টানা দাড় ও গরুতে টানা দাড়। হাতে টানা দাড় কৃষক নিজে হাতে টানে। আর গরু টানা দাড় গরুকে দিয়ে টানানো হয়। দাড় তৈরি করা হয় লম্বা কাঠের টুকরোকে ফুটো করে তারমধ্যে কতকগুলি ছোট ছোট লোহার গোঁজ কিংবা বাঁশের গোঁজ গেঁথে দিয়ে। এই গোঁজ লাগানো দাড়ের মাঝখানে থাকে লম্বা কাঠ কিংবা বাঁশের দণ্ড যা হাতল হিসেবে কাজ করে। হাত দাড় সাধারণত লম্বায় দুই থেকে তিন হাত এবং গরুটানা দাড় সাধারণত হাতে টানা দাড়ের থেকে এক দু'হাত বড় হয়ে থাকে।

● *ডিংরি (মুগুর)* : এই যন্ত্রটির সাহায্যে চাষ করা জমির বড় বড় ঢেলা ভাঙা হয়। এটি বাঁশ

কিংবা কাঠ দিয়ে তৈরি করা হয়। আয়তনে ছয়-সাত ইঞ্চি কাঠের টুকরো কেটে তার মাঝে ফুটো করে বাঁশের দুই তিন ফুট লম্বা হাতল যুক্ত করা হয়। আবার বসে ভাঙার জন্য ছোট আকৃতির মুগুর তৈরি করা হয়।

● *কোদলা (কোদাল)* : কৃষিকাজের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্র হল কোদাল। কোদাল দিয়ে জমির উঁচু নীচু যেমন সমান করা হয় তেমনি আবার প্রতিবছর চাষের সময় আল বাঁধা হয় এবং জমির আগাছাও অনেক সময় কোদাল দিয়ে পরিষ্কার করা হয়। এটি এক ফুট লম্বা ও ছয়/সাত ইঞ্চি চওড়া লোহার পাত দ্বারা তৈরি করা হয়। এর একদিকে শান দেওয়া থাকে আর অপর প্রান্তে গোলাকৃতি বড় ছিদ্র থাকে যেখানে বাঁশের কিংবা কাঠের দুই/তিন ফুট লম্বা হাতল লাগানো হয় এবং গোড়ার দিকে লোহার ছিদ্রের ভেতরে যেখানে হাতল ঢোকানো হয় তা যাতে শক্তভাবে আটকে থাকে তার জন্য ছিদ্রের পাশ দিয়ে বাঁশের কিংবা কাঠের গোঁজ ঢুকিয়ে দেওয়া হয়।

● *কাচিয়া (কাস্তে)* : অন্যান্য কৃষিযন্ত্রের মতো কাস্তেও একটি গুরুত্বপূর্ণ কৃষিযন্ত্র। এটি প্রত্যেক কৃষিজীবী পরিবারেই লক্ষ করা যায়। এর সাহায্যে শস্য কাটার পাশাপাশি কৃষিজমির আগাছাও পরিষ্কার করা হয়ে থাকে। কাস্তে আয়তনে সাধারণত ১/২ ফুট হয়ে থাকে। এটি নির্মাণের জন্য পাতলা বাঁকানো লোহার পাতের এক পাশে শান দেওয়া এবং হাতলের দিকে চোখা অংশটির সঙ্গে কাঠের হাতল লাগানো হয় যা 'আছারি' নামে পরিচিত।

● *হারপাট* : ধিমালদের একটি উল্লেখযোগ্য কৃষিযন্ত্র হল হারপাট। এটি দেখতে আধফালি চাঁদের মতো। এর সাহায্যে ধান, গম, ভুট্টা ও অন্যান্য শস্যবীজ রোদে শুকোনোর পর একত্রিত করা হয়। এটি কাঠের দ্বারা তৈরি করা হয়। কোদালের মতো ওপরের দিকে একটি গোল ছিদ্র থাকে সেখান থেকে পাঁচ/ছয় ফুট লম্বা একটি সরু বাঁশের হাতল লাগানো থাকে যেটা ধরে টেনে টেনে ছড়ানো শস্যবীজ একত্রিত করা হয়।

● *ডাউকি* : এই উপকরণটিও লোহার তৈরি। এর সম্মুখভাগ চওড়া তারপরেই ক্রমশ সরু হয়ে গেছে আঙ্গুলের মতো এবং প্রান্তভাগে তীক্ষ্ণ। প্রান্তভাগে লাগানো থাকে কাঠ বা গাছের ডাটা। এই যন্ত্রটি ব্যবহার করা হয় জমির আগাছা পরিষ্কার করার জন্য।

● *পিসনি (নিড়ানি)* : এই কৃষিযন্ত্রের সাহায্যে জমির আগাছা পরিষ্কার করা হয়। নিড়ানি সাধারণত লোহার পাত দিয়ে তৈরি করা হয়। সামানের দিকে চ্যাপটা এবং শান দেওয়া থাকে আর

গোড়ার দিকে পেরেকের মতো সরু থাকে যেখানে কাঠের হাতল লাগানো হয়। শুকনো জমির ছোট ছোট আগাছা পরিষ্কার করতে এটি বিশেষ উপযোগী। (চিত্র সংখ্যা : ৬ খ)

● *গোঁজা (গোঁজ)* : পাট জলে পঁচানোর জন্য এবং কোনস্থানে বাঁধ দেওয়ার প্রয়োজনে এটি ব্যবহৃত হয়। গোঁজ বাঁশের তৈরি করা হয়। এবং ছোট বড় বিভিন্ন আকৃতির হয়ে থাকে।

● চেলেঙ্গি ও রা (চ্যালা ও কূলো) : এই দুটি যন্ত্রই বাঁশের চ্যাপ্টা পাতি তুলে তৈরি করা হয়। সরু কাঁচা পাট দিয়েও তৈরি করা হয়। চ্যালা আকারে গোলাকৃতি হয় আর কূলো আকৃতিতে লম্বা। উভয় যন্ত্রই যে কোন শস্যবীজ ঝাড়াই ও বাছাই করার কাজে ব্যবহৃত হয়।

● *চাঙ্গারী* : চাঙ্গারী তৈরি করা হয় বাঁশ কিংবা কঞ্চি থেকে চ্যাপ্টা পাতি তুলে। এই যন্ত্রটি দ্বারা কৃষকেরা জমিতে সার ও অন্যান্য শস্যবীজ বহন করে।

● *কড়া (বাঁক/বাংকুয়া)* : বাঁক এই যন্ত্রটি সাধারণত শক্ত বাঁশের দ্বারা তৈরি করা হয়। এটি লম্বায় ৪/৫ ফুট হয়ে থাকে। এটি একেবারে সরল যন্ত্র। ভার বহন করার জন্য এটি ব্যবহার করা হয়।

● *চাঙ্গারি (ভাঁড়)* : দুটি ঝুড়িকে বাঁকের সাহায্যে দুদিকে ঝুলিয়ে বেঁধে ব্যবহার করলে সেটিকে একত্রে ভাঁড় বলা হয়। এর সাহায্যে কৃষকেরা বিভিন্ন সার ও কৃষিজ দ্রব্য বহন করে।

● *গুঁজি (খুঁট)* : বাঁশ দিয়ে এটি তৈরি করা হয়। এটি ব্যবহার করা হয় শুকনো জমিতে বিশেষ করে চারা গাছগুলিকে মাটি থেকে সোজাভাবে দাঁড় করিয়ে রাখার জন্য লঙ্কা, বেগুন, টমেটো প্রভৃতি চাষে এই খুঁট ব্যবহার করা হয়।

গ. শিকার নির্ভর লোকযন্ত্র :

সৃষ্টির আদি লগ্ন থেকেই মানুষ তার পেটের দাবি মেটাতে বনে বনে শিকার করে বেড়াত। আর ছোট বড় বিভিন্ন বন্য জন্তুকে ঘায়েল করার জন্য বিভিন্ন অস্ত্রের সাহায্য নিত। প্রথমে তারা গাছের ডাল ব্যবহার করত। আস্তে আস্তে বুদ্ধির ক্রমবিকাশের পথে নানা ধারালো পাথর ও পরে অন্যান্য ধাতু দিয়ে অস্ত্র নির্মাণ করতে শেখে। আজও লোকসমাজে এই ধারা অব্যাহত। তাই মানুষ আজও বিভিন্ন স্থলজ জন্তু জানোয়ার ও জলজ প্রাণী ও মাছ শিকারের জন্য বিভিন্ন যন্ত্র নির্মাণ করে থাকে।

মাছ ধরার যন্ত্র :

উত্তরবঙ্গে পর্যাপ্ত পরিমাণে খাল-বিল-পুকুর-নদী-নালা রয়েছে যেখানে প্রচুর পরিমাণে মাছ পাওয়া যায়। ফলে মাছ এখানকার বেশিরভাগ জাতি-জনজাতির প্রতিদিনের খাদ্য তালিকার উপাদান। ধিমালদেরও খাদ্য তালিকায় শাকসব্জীর থেকে মাছই বেশি প্রিয় বলে জানা যায়। এমনকি অনেক ধিমাল তাদের মাছ ধরার প্রবণতাকে লক্ষ করে বলেছেন যে ধিমালদের রক্তের মধ্যেই মিশে রয়েছে মাছ ধরার নেশা। তাই কচিকাঁচা আট থেকে শুরু করে আশি বছরের বৃদ্ধ বৃদ্ধাদেরও দেখতে পাওয়া যায় তারা মাছ ধরার জন্য বেড়িয়ে পড়ে নদী-নালা ও বিভিন্ন জলাশয়ে। আর এই মাছ তারা খালি হাতে যেমন ধরে তেমনি বিভিন্ন যন্ত্রেরও সাহায্য নেয়। ধিমালদের মাছ ধরার যন্ত্রগুলি হল—

● *নাফিজালে (চারকোণাকৃতি জাল বিশেষ)* : প্রথমে দুটি বাঁশের বাতাকে কিংবা কঞ্চিকে ভালো করে ছোট নিয়ে তার দু'মাথায় সামান্য কেটে গাঁট তৈরি করা হয়। তারপরে সেই বাতা বা কঞ্চি দুটি আড়াআড়ি ভাবে বাকিয়ে মাঝখানে বেঁধে দেওয়া হয়। আর নিচে বাতার মাথায় চৌকোণাকৃতি জালটি বাঁধা হয়। আর দুটি বাতা আড়াআড়ি ভাবে সেখানে যুক্ত হয়েছে সেখানে একটি লম্বা ছয়-সাত ফুট বাঁশ ও দড়ি বাঁধা হয় তারপর বাঁশের গোড়ার দিকে পা দিয়ে দড়ি ধরে জালটি ডাঙা থেকে জলে ফেলা হয় এবং কিছুক্ষণ পরপর তোলা হয় আবার বাঁশ ছাড়া শুধুমাত্র জালটি দিয়েও কম জল থেকে মাছ ধরা যায়। এই জাল দিয়ে সাধারণত ছোট মাছ ধরা হয়ে থাকে। (চিত্র সংখ্যা : ৭ ক)

● *ফাঁসি জালে* : এই জাল নাইলন সুতো দিয়ে তৈরি লম্বা ও সমান খোপ বিশিষ্ট বিশেষ ধরনের জাল। এই জালের দুপাশে দুজনে ধরে জলের মধ্যে টেনে মাছ ধরে। আবার জলাশয়ে রাত্রে বা দিনে পেতে রেখেও মাছ ধরা হয়। মাছ চলাচলের সময় সুতোর ভেতরে একবার ঢুকে গেলে আর বের হতে পারে না— চোয়ালে কিংবা পৃষ্ঠ পাখনায় আটকে থাকে তাই এই জালকে ফাঁসি জাল বলা হয়।

● *ফেরকি জালে (ছাঁপি জাল)* : এই জাল নাইলন সুতো দিয়ে তৈরি করা হয় গোলাকৃতি জালের নিচের দিকে লোহার কাঠি লাগানো থাকে। বিশেষ কায়দায় জলের মধ্যে কিংবা ডাঙ্গায় দাঁড়িয়ে এই জাল জলে ছুড়ে দেওয়া হয়। নদী কিংবা পুকুরের মাছ ধরে ধিমালরা এই জালের সাহায্যে।

● *মশারি জালে* : এই জাল মশারির মতো ছোট ছোট ক্ষোপ থাকে। এই জাল বিশাল লম্বা হয়ে থাকে। বিরাট পুকুরের বড় এবং ছোট সমস্ত মাছই এই জাল দিয়ে ধরা হয়। এই জালের উপরের দিকে শোলা কিংবা প্লাস্টিকের ড্রাম বেঁধে দেওয়া হয় এবং জালের নিচেও কাঠি যুক্ত করা হয়ে থাকে জালটি যাতে সহজে জলে না ভাসতে পারে। আর জালের দুপাশ থেকে সমপরিমাণ লোক জাল টানতে থাকে।

● *ধোপ জালে* : এই জাল দৈর্ঘ্যে আট থেকে দশ ফুট এবং প্রস্তে তিন-চার ফুটের মতো হয়। এই জালের দু'পাশে দুটি বাঁশের লাঠি লাগানো থাকে। দু'পাশে দু'জন বাঁশ ধরে জাল সামনের দিকে টেনে নিয়ে যায় আর একটু পর পর জালটি তুলে। এই জালের সাহায্যে ধিমালরা সাধারণত ছোট ছোট মাছ ধরে থাকে। বড় মাছ সাধারণত এই জালে ধরা পরে না।

● *টেমাই* : বাঁশ দিয়ে তৈরি মাছ ধরার একটি অন্যতম যন্ত্র হল টেমাই। বাঁশকে মাপ মতো কেটে প্রথমে কাঠি তৈরি করা হয়। তারপর পাটের সুতো কিংবা চাই সুপারি গাছের বাকল থেকে তৈরি সুতো দিয়ে বাঁশের কাঠিগুলিকে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে বুনে তার সঙ্গে কাঠি দ্বারা চোখ ও মুখ তৈরি করা হয়। তারপর টেমাইর মুখ আটকে দিয়ে জমির আলোর মধ্যে কিংবা নদীর মাঝে কম জলে দুপাশ থেকে বেঁধে স্রোতে বসানো হয়। টেমাইর চোখগুলি এমন ভাবে তৈরি করা হয় মাছ সেখান দিয়ে সহজেই ভেতরে ঢুকে যেতে পারে কিন্তু সেখান দিয়ে কোনমতেই বেরোতে পারে না। কিন্তু টেমাইর ভেতর দিয়ে জল সহজেই বেরিয়ে যেতে পারে। ভেতরের মাছ টেমাইর মুখ খুলে বের করে নেওয়া হয়। ছোট ছোট মাছ বিশেষ করে দাঁড়িকা, পুঁটি, খলিসা, কই, মাগুর, শিঙি, ল্যাটা, পয়া ইত্যাদি মাছ এর সাহায্যে ধরা হয়ে থাকে।

● *ডসকা বা সো (ধরকা)* : এই যন্ত্রটি মূলত একটি মোটা বাঁশের টুকরো দিয়ে তৈরি করা হয়। প্রথমে যত্ন সহকারে বিশেষ পদ্ধতিতে বাঁশটির একপ্রান্ত সরু সরু করে ফাটিয়ে তার ভেতরে মুখের দিকে বাতার তৈরি কিংবা লোহার তৈরি গোলাকার চাকার মত রিং ঢুকিয়ে তার কিংবা দড়ি দিয়ে গাঁথা হয়। যাতে যন্ত্রটির মুখ (সামনের অংশ) খোলা থাকতে পারে। তারপর এই যন্ত্রটিকে আলের মাঝে প্রচণ্ড স্রোতের মধ্যে উজান দিকে মুখ করে বসিয়ে দেওয়া হয়। যন্ত্রটি যাতে ভেসে না যায় তার জন্য ডসকায় দড়ি লাগিয়ে একটি ছোট খুঁটের সঙ্গে মাটিতে পুঁতে রাখা হয়। এই যন্ত্রটির দ্বারা কই, মাগুর, ল্যাটা, পুঁটি প্রভৃতি মাছ ধরা হয়ে থাকে। (চিত্র সংখ্যা : ৭ খ)

● *পলো/পলুই* : ধিমালদের মাছ ধরার বিভিন্ন যন্ত্রের মধ্যে পলো বা পলুই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এটি তারা বিশেষ পদ্ধতিতে তৈরি করে। প্রথমে দুই ফুট লম্বা একটি বাঁশের টুকরো থেকে ছোট ছোট পাতলা কাঠি তোলা হয়। তারপর সেটিকে বিশেষ কায়দায় পাট কিংবা সুতোর সাহায্যে বুনে সেটির উপরে ও নিচের দিকে বাঁশের বাতা গোলাকার রিং এর মতো করে ভেতরের দিকে লাগানো হয়। এর নিচের দিকে মুখ বেশি ফাকা থাকে। আর উপরে তুলনামূলক ভাবে কম। উপরে আবার অনেক সময় সাইকেলের টায়ার দিয়েও চারপাশ বাঁধা হয়। মাছ লক্ষ করে উপর থেকে পলো নিক্ষেপ করা হয়। আর উপরের গোলাকার মুখ দিয়ে পুরো হাত ঢুকিয়ে জল থেকে মাছ সংগ্রহ করা হয়। বেশি ছোটমাছ যেমন পলোর সাহায্যে ধরা যায় না তেমনি আবার বেশি বড় মাছও পলোর সাহায্যে ধরা যায় না।

● *জান বা চান* : মাছ ধরার জন্য ধিমালরা জান বা চান নামক যন্ত্রটিকে ব্যবহার করে থাকে। এই জান তৈরি করা তুলনামূলকভাবে অন্যান্য যন্ত্র অপেক্ষা পরিশ্রম সাপেক্ষ। এটিকে তৈরির জন্য প্রথমে বাঁশের পাতলা পাতি তোলা হয়। তারপর পাতিগুলিকে পাশাপাশি সাজিয়ে পাট কিংবা চাই সুপারি গাছের বাকলের তৈরি সুতো দিয়ে গেঁথে জান তৈরি করা হয়। নদী-নালাকে প্রথমে বাঁধ দিয়ে জল আটকানো হয় তারপর বাঁধের পেছন দিকে যন্ত্রটি বসানোর পর আটকানো জল এমনভাবে ছাড়া হয় যাতে জল ঐ জানের উপর আছড়ে পড়ে এবং জানের ফাঁকা অংশ দিয়ে সহজেই বেড়িয়ে যেতে পারে। আর জলের সাথে ভাটির দিকে আসা মাছগুলি জানের উপর পড়ে থাকে। সূক্ষ্ম ফাঁকা থাকায় জল বেড়িয়ে যেতে পারলেও মাছ আটকে থাকে। ছোট বড় বিভিন্ন আকৃতির মাছ এই যন্ত্রের সাহায্যে ধরা হয়।

● *দুরুঙ্গি (খলুই বা খলাই)* : ধিমালরা মাছ ধরার পর যেখানে সংগ্রহ করে রাখে হয় তাকে 'দুরুঙ্গি' বলে। দুরুঙ্গি বাঁশের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পাতি তুলে বিভিন্ন আকৃতির তৈরি করা হয়। দুরুঙ্গি বোনার সময় সূক্ষ্ম ছিদ্র রাখতে হয় যাতে করে ভেতরের জল অতি সহজেই বাইরে বেরিয়ে আসতে পারে। তবে ধিমালদের দুরুঙ্গি অন্যান্য জাতি-জনজাতি থেকে আলাদা। কারণ এটি তারা বাঁশের পাশাপাশি কাঁচা পাট দিয়ে তৈরি করে। (চিত্র সংখ্যা : ৭ গ)

● *জাকই* : এটি বাঁশের সাহায্যে তৈরি তিন কোণাকৃতি যন্ত্র বিশেষ। উত্তরবঙ্গের আদি জনজাতিরা এই যন্ত্রটিকে তাদের নিজস্ব যন্ত্র বলে দাবি করে। চালুনীর মতো দেখতে এই যন্ত্রটির

সাহায্যে যে কোন ছেলে-মেয়ে অতি সহজেই মাছ ধরতে পারে।

● *বঁড়শি* : ধিমালরা মাছ ধরার জন্য নানা রকম লোহা পেতলের তৈরি বঁড়শিও ব্যবহার করে থাকে। এই বঁড়শি নানা রকম হয়। যথা—

● *ছিপ বঁড়শি* : সরু বাঁশ কিংবা মোটা কঞ্চির মাথায় সুতো লাগিয়ে তার সঙ্গে শোলার তৈরি টোন বা ফাতনা সহযোগে বঁড়শিকে গেথে ডাঙায় দাঁড়িয়ে মাছ ধরা হয়। আর বঁড়শিতে যে টোপ ব্যবহার করা হয় তা ঘরে তৈরি কোন খাবার বিশেষ বা কখনো আটা দিয়েও টোপ তৈরি করা হয়।

● *নল বঁড়শি* : এক হাত বা দেড় হাত লম্বা মোটা পাটকাঠির মাঝখানে সুতো বেঁধে তার মাথায় বঁড়শি গেঁথে বঁড়শিতে কেঁচো বা বাঁশের ভেতরে থাকা টোপ লাগিয়ে অল্প জলে পাতা হয়। মাছ টোপ খেয়ে বঁড়শিতে আটকে থাকে।

● *নল বর্শা* : পাঁচ ছয় ফুট লম্বা সরু বাঁশ কিংবা মোটা কঞ্চির মাথায় সুতো বাঁধা বঁড়শির সঙ্গে তাজা ছোট ব্যাঙ কিংবা চ্যাঙ অথবা ল্যাটা মাছ গেঁথে নদীর মধ্যে জলের সঙ্গে ভাসিয়ে রেখে বাঁশ কিংবা কঞ্চিকে মাটিতে গেড়ে রাখা হয়। আর বড় মাছ বিশেষ করে বোয়াল ব্যাঙ অথবা চ্যাং মাছ খেয়ে বঁড়শিতে আটকে যায়। বড় আকৃতির বঁড়শির জন্য একে বলা হয় বর্শা।

● *ধুমছি* : এটি কাদার ভেতরে লুকিয়ে থাকা মাছ ধরার জন্য কেটার মতো আরেকটি যন্ত্র বিশেষ। এই ধুমছি হল আঙুলের মতো সরু লোহার শিক। এই শিক মোটামুটি দুই থেকে তিন ফুট লম্বা একটি বাঁশের মাথায় লাগানো থাকে। বিশেষ করে কুচিয়া, বাণ মাছ এই যন্ত্রের সাহায্যে ধরা হয়।

● *কোচা বা কোচ* : ধিমালদের মাছ ধরার একটি অন্যতম যন্ত্র হল কোচা বা কোচ। এই কোচা বিভিন্ন ধরনের হয়। কখনো বাঁশের কাঠির নীচে নীচে তীক্ষ্ণ লোহার আল বসানো হয় আবার কখনো ছাতার শলাগুলিকে কামারের সাহায্যে পিটিয়ে চোখা করে এবং অপরপ্রান্ত একসঙ্গে যুক্ত করে বাঁশের ভেতরে ঢুকিয়েও কোচা তৈরি করা হয়। কোচা সাধারণত দূর থেকে ছুঁড়ে মাছ ধরা হয়।

ঘ. মনোরঞ্জন নির্ভর লোকযন্ত্র :

মানুষ তার দৈনন্দিন প্রয়োজন ছাড়াও আমোদ-প্রমোদের জন্য যে সমস্ত যন্ত্র ঘরে তৈরি করে সেগুলিও লোকযন্ত্রের অন্তর্গত। আর এগুলির মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন প্রকার বাদ্যযন্ত্র।

বাদ্যযন্ত্রের প্রকারভেদ নিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মধ্যে নানা মত প্রচলিত থাকলেও বাদ্যযন্ত্রের উদ্ভব সম্পর্কে প্রায় সকল পণ্ডিতগণই একমত পোষণ করেছেন যে সমাজ গঠনের প্রাক্কালেই অর্থাৎ মানব সভ্যতার আদিম স্তরেই বাদ্যযন্ত্রের উদ্ভব হয়। মানুষ যখন শিকার করে এসে গুহা বা গাছের তলায় আশ্রয় নিত এবং শিকারের আনন্দে মেতে উঠত তখন থেকেই তারা নানা অঙ্গভঙ্গির সঙ্গে শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রতঙ্গ (ঊরু, হাত তালি, পাছা) চাপড়ে কিংবা গাছের গুড়ির মাঝে গর্ত করে চামড়া দিয়ে ঢেকে তার উপর গাছের ডাল দিয়ে সজোরে আঘাত করে কিংবা পাথরে পাথরে ঠুকে শব্দ সৃষ্টি করত। এখান থেকেই বাদ্যযন্ত্রের যাত্রা। সমাজতাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন যে উক্ত আদিম প্রক্রিয়ায় শব্দ সৃষ্টির উপাদান থেকেই ঝাঁঝর, করতাল, ঢোল, দুন্দুভি ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্রের জন্ম হয়েছে। আজও সেই আদিম পদ্ধতিতেই গাছের গুঁড়ির দুপাশে কিংবা একপাশে চামড়া দিয়ে ঢেকে বিভিন্ন ঢাক কিংবা ড্রাম তৈরি করা হয়। সুতরাং বলা যায় আদি বাদ্যযন্ত্রগুলিই সময়ের চক্রে ক্রমশ উন্নত হয়েছে কিন্তু মূল কাঠামো একই রয়ে গেছে।

অনেকে ব্যবহারিক প্রয়োজনের ভিত্তিতে বাদ্যযন্ত্রগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। যথা—

ক. সঙ্গীতের সঙ্গে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রগুলি গীতানুগ।

খ. নৃত্যের সঙ্গে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রগুলি নৃত্যানুগ।

গ. গীতানুগ ও নৃত্যানুগ এর বাইরে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রগুলি হল 'শুষ্ক'।

উনিশ শতকে পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞ মাইয়ো সমগ্র বাদ্যযন্ত্রকে চারভাগে বিভক্ত করেছেন।

ক. অটোফোনস— যে যন্ত্রগুলি তৈরি হওয়ার পর সুর বাঁধার প্রয়োজন হয় না।

খ. মেমব্রানোফোনস— যে যন্ত্রগুলি আঘাতের সাহায্যে বাজানো হয়।

গ. কর্ডোফোনস— তার দিয়ে তৈরি বাদ্যযন্ত্র।

ঘ. এয়ারোফোনস— যে যন্ত্রগুলি ফুঁ দিয়ে বাজানো হয়।[৯]

ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র প্রসঙ্গে ২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে ২০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে আচার্য ভরত তার 'নাট্যশাস্ত্র'তে চার রকম বাদ্যযন্ত্রের কথা উল্লেখ করেছেন—

"ততমচৈবানদ্ধং চ ঘনং শুষিরমেরচ
চতুর্বিধমতু বিজ্ঞেয় মতোদ্যং লক্ষণাভিতম।।
ততমতন্ত্রীগতং জ্ঞেয়মবনদ্ধং তু পশুকরম্।
ঘনমতলস্তু বিজ্ঞেয়ং শুষির বংশ উচ্চতে।।"[১০]

অর্থাৎ এই নিয়মিত ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রগুলিকে চারভাগে ভাগ করা হয়েছে, যেমন— 'তত' বা তারের যন্ত্র। 'আনন্ধ' বা আচ্ছাদনযুক্ত যন্ত্র। ঘন বা ধাতু নির্মিত নিরেট যন্ত্র এবং শুষির বা ছিদ্রযুক্ত বায়ু পুরণে বেজে ওঠে এমন যন্ত্র। মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে আনন্ধ শ্রেণির বাদ্যযন্ত্র সবার প্রথমে আবিষ্কৃত হয়। এরপর তন্তু বা তত জাতীয় বাদ্যযন্ত্রের আবিষ্কার হয়। আর সবশেষে হয় শুষি শ্রেণির বাদ্যযন্ত্রের।

ধিমাল জনজাতির মধ্যে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্রগুলিকেও উপর্যুক্ত চারটি ভাগে ফেলে আলোচনা করা যেতে পারে। যেমন—

১. তারের তৈরি বাদ্যযন্ত্র :

যে সকল বাদ্যযন্ত্র তারের উপর আঘাত করে বাজানো হয় সেই যন্ত্রগুলিকেই তত বা তারের তৈরি বাদ্যযন্ত্র বলা হয়। ধিমালরা লোকসঙ্গীত ও লোকনৃত্যে বিভিন্ন তারের সাহায্যে তৈরি বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করে থাকে। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— উরণি, একতারা, দো-তারা, সারিঙ্গা প্রভৃতি।

- *উরণি* : ধিমালদের ব্যবহৃত একটি আদিম তার যন্ত্র হল উরণি। এই বাদ্যযন্ত্রের প্রচলন উত্তরবঙ্গের ধিমালদের মধ্যেই সর্বাধিক লক্ষ করা যায়। উরণি তৈরির জন্য ধিমালরা নারকেল মালাই আড়াআড়ি ভাবে কেটে বাঁশের হাতল লাগায়। আর নারকেলের মালাই এর উপরের খোলা অংশে গোসাপের চামড়া দিয়ে ছাউনি দিয়ে তার উপর কাঠের ঘোড়া বসিয়ে তার উপর একটি তার মালাই এর শেষপ্রান্ত থেকে বাঁশের মাথার দিকে কানের সঙ্গে যুক্ত করা হয় যার সাহায্যে তারটি টান রাখা হয়। উরণি ছড়ের সাহায্যে বাজানো হয়। ধিমালরা ছড়টি তৈরি করে ঘোড়ার লেজের চুল দিয়ে। এটি ধনুকাকৃতি দেখতে এবং এর হাতলটি তৈরি করা হয় বাঁশ দিয়ে। এই বাদ্যযন্ত্রটি সাধারণত ধিমাল লোকসঙ্গীতে ব্যবহৃত হয়। (চিত্র সংখ্যা : ৮ ক)

● *একতারা* : সাধারণত একটি তার বিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্রই হল একতারা। ধিমাল জনজাতির মধ্যেও এই যন্ত্রটির প্রচলন রয়েছে। যন্ত্রটি তৈরি করা হয় সাধারণত লাউয়ের বশ, বেল, নারকেলের মালাই, কাঠের খোল, বাঁশ, তার এবং চামড়া দিয়ে। প্রথমে লাউ-এর বশ কিংবা নারকেলের মালাইটিকে নির্দিষ্ট মাপে কেটে নিয়ে তারপর বাঁশের একটি গিঁটসহ দেড় থেকে দুই ফুট অংশ কেটে নিয়ে তার একপাশে গিঁট রেখে দু'পাশ থেকে বাতা বের করে লাউয়ের বশ কিংবা নারকেলের মালার সঙ্গে দু'দিক থেকে শক্ত করে বেঁধে দেওয়া হয়। উপরের দিক থেকে নিচ পর্যন্ত গুনো কিংবা নাইলনের তার লাগানো হয়। বাঁশের ফ্রেমের মাথার দিকে একটি ছোট কাঠি থাকে যা কান নামে পরিচিত। যেখানে তার পেঁচানো থাকে নিদিষ্ট মাপের থেকে একটু বেশি করে। তারটিকে ঢিলা কিংবা টান করার জন্য এই কানটিকে ঘোরানো হয়। এই কানই হল একতারার চাবি কাঠি। যন্ত্রটি বাজানোর সময় বাঁশের ফ্রেমটি চেপে ধরে একহাতেই বাজাতে হয়।

● *দোতারা* : একতারার মতো দোতারাও তত জাতীয় বাদ্যযন্ত্র। জনপ্রিয়তার দিক থেকে একতারার থেকে উঁচুতে এর স্থান। উত্তরবঙ্গের বিখ্যাত লোকসঙ্গীত ভাওয়াইয়াতে এই যন্ত্রটির ব্যাপক প্রচলন আছে। ধিমালরাও তাদের নিজস্ব বেশির ভাগ সঙ্গীতে এই বাদ্যযন্ত্রটি ব্যবহার করে থাকে। দোতারা নাম হলেও ধিমালদের এই বাদ্যযন্ত্রটিতে বেশির ভাগ সময় দুই এর বেশি তার যুক্ত থাকে। কখনো চারটি আবার কখনো ছয়টি। ধিমালরা দোতারা তৈরির জন্য বাঁশের একেবারে গোরার মাটির নিচের থেকে দুই-তিন ফুট উঁচু পর্যন্ত শক্ত গিঁটযুক্ত অংশটি বেশি ব্যবহার করে থাকে। তাছাড়াও শক্ত কাঠ, কাঁঠাল, নিম, ছাতিম প্রভৃতি কাঠও ব্যবহার করে থাকে। বাঁশের নিচের অংশ কিংবা কাঠের নিচের অংশ পেছনের দিকে চওড়া রাখতে হয় এবং সামনের দিকে একটু সরু। তারপর সেটিকে ভালো করে শুকিয়ে নিয়ে বাঁশ কিংবা কাঠের চওড়া পাশে খোদাই করে নেওয়া হয়। তারপর সেই খোদাই করা প্রশস্ত অংশে গোসাপের চামড়া অথবা ছাগলের চামড়া দিয়ে আবৃত করা হয়। বাঁশ কিংবা কাঠের উপর দিকে প্রয়োজনীয় সংখ্যক তিন-চার ইঞ্চি বাঁশ কিংবা কাঠের কাঠি যুক্ত থাকে যেগুলির সঙ্গে তার যুক্ত থাকে। আঞ্চলিক ভাষায় এই কাঠিগুলি বিভিন্ন নামে পরিচিত। উত্তরবঙ্গে কান নামে পরিচিত এই কাঠিগুলি। এই কান ঘুরিয়ে ঘুরিয়েই বাদ্যকার সুরের লয় ঠিক করে থাকেন। দোতারায় ধিমালরা সাধারণত নাইলনের তার ব্যবহার করে থাকে। তারগুলি বাঁধা হয় তলার দিকের শেষ প্রান্তে ফেসি নামে একটি লোহা বা পিতলের সাথে। আর চামড়ার ছাউনির উপরে মাঝামাঝি জায়গায় একটি কাঠের কিংবা হাড়ের খাঁজ করা

ছোট টুকরো ব্যবহার করা হয়ে থাকে। যাকে ঘোড়া বলা হয়। এটি ব্যবহার করা হয় যাতে চামড়ার সাথে তার যাতে স্পর্শ করতে না পারে। দোতারার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল কটি। এটি গরু মহিষের শিং, হাড় অথবা কাঠ দিয়ে তৈরি করা হয়। আনুমানিক দু'হাত লম্বা হাল্কা বাদ্যযন্ত্রটি বাম হাতে আড়াআড়ি ভাবে ধরে ডান হাতে কটির সাহায্যে সূক্ষ্ম আঘাত করে বাজানো হয়। (চিত্র সংখ্যা : ৮ খ)

- *সারিঙ্গা* : ধিমালদের মধ্যে প্রচলিত একটি উল্লেখযোগ্য বাদ্যযন্ত্র হল সারিঙ্গা। একসময় ধিমাল সমাজে এই বাদ্যযন্ত্রটি বহুল ব্যবহার হলেও বর্তমানে উত্তরবঙ্গের ধিমাল সমাজে উপযুক্ত বাদ্যকারের অভাবে এর ব্যবহার কমে আসছে। এই বাদ্যযন্ত্রটিতেও দোতারার মতো চামড়া, ঘোড়া, ফেসি লক্ষ করা যায়। এই যন্ত্রটিতে মূলত তিনটি তার থাকে। এগুলি দোতারার মতোই যুক্ত করা হয়। সারিন্দার মাথায় থাকে কাঠের বা বাঁশের নকশা করা বিভিন্ন পাখির বিশেষ করে ময়ূর, ময়না কিংবা কাকাতুয়ার প্রতিকৃতি। সারিঙ্গ তৈরির জন্য মূলত কাঁঠাল বা গামারি কাঠকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। সারিঙ্গা দৈর্ঘ্যে দোতারার মতোই সাধারণত দেড় থেকে দু'ফুট হয়ে থাকে। সারিঙ্গার নিচের দিকে চওড়া ডিম্বাকৃতি অংশটি ফাঁপা করা হয়ে থাকে এবং এর উপর গোসাপের চামড়া দিয়ে আচ্ছাদন দেওয়া হয়। চামড়ার উপর আবার একটি কাঠের দুই ইঞ্চি লম্বা কাঠি যুক্ত করা হয়ে থাকে যাকে ঘোড়া বলে। এই ঘোড়ার উপর তারগুলি বসিয়ে দেওয়া হয় যাতে তার নিচে চামড়ার আচ্ছাদনের উপর স্পর্শ না করে। এই যন্ত্রটি বাজানো হয় 'ছড়' দিয়ে। আর এই ছড় তৈরি করা হয় বাঁশের বাতা দিয়ে এবং যা দেখতে অনেকটা ধনুকের মতো। ঘোড়ার লেজের চুল লাগানো হয় ছড়ের মধ্যে। এই তিনটি তারকে সাংগীতিক ভাষায় যথাক্রমে ব্যেম, সুর এবং জিন বলা হয়। এই বাদ্যযন্ত্রটি মূলত বিবাহ সঙ্গীতের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়। তাছাড়াও উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন লোকনাট্য ও সঙ্গীতে এই সারিঙ্গা ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

২. চামড়ার তৈরি বাদ্যযন্ত্র :

যে সমস্ত বাদ্যযন্ত্রের উপর চামড়ার ছাউনি দেওয়া হয় এবং ছাউনির উপর হাত বা কাঠের দ্বারা আঘাত করে বাদ্যযন্ত্রটি বাজানো হয় তাকে অবনদ্ধ বা আনন্ধ বাদ্যযন্ত্র বলা হয়। ধিমালদের মধ্যে এই শ্রেণির বাদ্যযন্ত্রের ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ করা যায়। ঢাক, ঢোল, চোঙা এই শ্রেণির বাদ্যযন্ত্র।

- *ঢাকে (ঢাক)* : ঢাক হিন্দু বাঙালি সমাজের মতো ধিমালদের মধ্যেও প্রচলিত এক অতি জনপ্রিয় লোকবাদ্য। সামাজিক যে কোন অনুষ্ঠানে বিশেষ করে গ্রাম পূজা ও পারিবারিক বিবাহ ও নানা আচার অনুষ্ঠানে এই বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার করা হয়। ঢাক তৈরি করা হয় গামারি কাঠ দিয়ে। কাঠের খোলের দুই মুখে ছাগলের ও হরিণের চামড়া দিয়ে ছাউনি দেওয়া হয়। এই দুটি মুখের ব্যাস হয় সাধারণত তের (১৩) থেকে ষোল (১৬) ইঞ্চির মধ্যে। দুটি মুখের চামড়াকে টান করে ধরে রাখার জন্য চামড়া বা মোটা সুতোর তৈরি তার পনের-কুড়িটির মতো ব্যবহার করা হয়। এবং সুতো টানার জন্য ছোট ছোট আংটির মতো রিং ব্যবহার করা হয়। ঢাক বাজানোর জন্য দুটি কাঠি ব্যবহার করা হয় একে ডাইনা ও বায়া বলা হয়। ডাইনা বেতের আর বায়া বাতা দিয়ে তৈরি করা হয়। ঢাক কাঁধের সঙ্গে ঝুলিয়ে ও মাটিতে রেখেও বাজানো হয়। কাঁধের সঙ্গে ঝোলানোর জন্য চামড়ার তৈরি ফিতের উপর কাপড় দিয়ে মুড়ে দেওয়া হয়। (চিত্র সংখ্যা : ৮ গ)

- *ঢোল* : ঢাকের মতো ঢোলও ধিমালদের একটি অন্যতম লোকবাদ্য। পিপাকৃতি ড্রামজাতীয় এই বাদ্যযন্ত্রটি দুই ফুটের মতো লম্বা হয়ে থাকে। উভয় দিকে খোলা অংশে গরুর চামড়ার ছাউনি দেওয়া হয়। সাধারণত ঢোলকের বা দিকের চওড়া আট ইঞ্চি আর ডান দিকে চওড়া নয় ইঞ্চির মত হয়। গলায় ঝুলিয়ে বা দিকে হাত দিয়ে ও ডান দিকে কাঠি দিয়ে আবার অনেক সময় শুধু হাতের সাহায্যে বাজান হয়। (চিত্র সংখ্যা : ৮ ঘ)

- *চোঙামেরদং* : ধিমালদের একেবারে নিজস্ব লোকবাদ্যযন্ত্র হল চোঙামেরদং। এই বাদ্যযন্ত্রটি তৈরি করা হয় বোরো বাঁশের দেড় থেকে দু'ফুট লম্বা গিটযুক্ত মোটা বাঁশের টুকরো দিয়ে। বাঁশের মাঝখানের কিছু অংশ তুলে সেখানে দোতারায় যুক্ত ঘোড়ার মতো চারটি কাঠের টুকরো যুক্ত করে তার উপর বাঁশের তৈরি শলা এক থেকে দেড় ইঞ্চি ব্যবধানে সমান্তরালভাবে বসানো হয় এবং শলাটি বাঁশের থেকে সামান্য উঁচু করে দু'পাশে শিকের মতো দড়ি দিয়ে বেঁধে দেওয়া হয়। এবং দুটি শলার ঠিক মাঝখানে বাঁশের পাতির মতো দুই ইঞ্চি চওড়া ও দুই ইঞ্চি লম্বা পাতি যুক্ত করা হয়। এটির উপরই আঙুলের সাহায্যে আঘাত করে এই বাদ্যযন্ত্রটি বাজানো হয়। ধিমালদের যেকোন অনুষ্ঠানে এই বাদ্যযন্ত্রটি অত্যন্ত আবশ্যক। (চিত্র সংখ্যা : ৮ ঙ)

৩. ধাতুর তৈরি বাদ্যযন্ত্র :

● *গোমনা* : ধিমালদের মধ্যে ধাতুর তৈরি বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার তুলনামূলকভাবে অনেক কম। শুধুমাত্র গোমনা নামক একটি বাদ্যযন্ত্র লক্ষ করা যায়। এটি লোহা অথবা ব্রোঞ্চ দিয়ে তৈরি বাদ্যযন্ত্র বিশেষ। এটি তারা নিজেরাই লোহাকে গলিয়ে তৈরি করে থাকে। বাদ্যযন্ত্রটি দেখতে অনেকটা সাপের ফনার মতো। এটিকে মুখে লাগিয়ে হাতে টেনে বাজানো হয়ে থাকে। (চিত্র সংখ্যা : ৮ চ)

৪. ছিদ্রযুক্ত বাদ্যযন্ত্র :

ধিমালদের মধ্যে অন্যান্য নানাপ্রকার বাদ্যযন্ত্রের পাশাপাশি ছিদ্রযুক্ত বাদ্যযন্ত্রও লক্ষ করা যায়। এই শ্রেণিতে রয়েছে বাঁশি, শঙ্খ প্রভৃতি।

● *বাঁশি* : বাঁশি ধিমালদের অন্যতম জনপ্রিয় লোকবাদ্য। তাদের বিভিন্ন লোকসঙ্গীতে বাঁশির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। আবার কখনো শুধুমাত্র বাঁশি বাজিয়েও মানুষ আনন্দ পায়। ধিমালরা বাঁশি তৈরি করে সরু বাঁশের সাহায্যে। বাঁশকে একহাত আয়তনের কেটে নিয়ে সেটিয়ে প্রয়োজন মতো পাঁচ ছয়টি ফুটো করে তৈরি করে থাকে। আবার কোন কোন বাঁশিতে ফুটো থাকে না। বাঁশি নানা প্রকারের হলেও ধিমালদের মধ্যে আড় বাঁশির প্রচলনই সর্বাধিক। বাঁশের একই রেখায় ছিদ্রগুলিতে আঙুল চেপে ছিদ্রগুলি বন্ধ করে ও ছেড়ে দিয়ে বিচিত্র ধ্বনি তোলা হয়। আড়াআড়ি ভাবে ধরে এই বাঁশিতে ঠোঁট রেখে ফুঁ দিয়ে এই বাঁশি বাজানো হয় বলে এর নাম হয়েছে আড়বাঁশি। তাছাড়া তালপাতা ও নারকেল পাতা দিয়েও ধিমাল ছেলে মেয়েরা কলমের মতো পেঁচিয়ে তাতে ফুঁ দিয়ে বাঁশির মতো শব্দ তৈরি করে আনন্দ উপভোগ করে থাকে। (চিত্র সংখ্যা : ৮ ছ)

● *শঙ্খ* : ধিমালদের মধ্যেও শঙ্খের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যেকোন মঙ্গল কাজে এবং প্রাকৃতিক দূর্যোগের সময়ও ভীতি অথবা অশুভ শক্তিকে দূর করতে ধিমালরা শঙ্খ বাজিয়ে থাকে।

ঋ. লোকবাসগৃহ :

বস্তুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির মধ্যে ঘর বাড়িকেও আলোচনা করা যেতে পারে। একই ভৌগোলিক পরিবেশে উপকরণের সাদৃশ্য থাকলেও প্রত্যেক লোক সমাজ তাদের নিজস্ব ঘরানায় তাদের ঘর বাড়ি তৈরি করে থাকে। তাই ধিমালদের তৈরি ঘর বাড়িতেও ভিন্নতা লক্ষ করা যায়। উত্তরবঙ্গের ধিমালরা মূলত তরাই অঞ্চলের বাসিন্দা। তাই স্বাভাবিক ভাবেই তরাইয়ের

ভৌগোলিক পরিবেশ ও প্রাকৃতিক উপাদান তাদের জীবনশৈলীর পাশাপাশি তাদের ঘরবাড়ি তৈরিতেও গভীর প্রভাব ফেলেছে। যেমন তরাইয়ের গাছ, বাঁশ ও উৎপাদিত ফসল ধানের খড়, পাট এবং নদ-নদীতে প্রাপ্ত এঁটেল মাটিই হল ধিমালদের ঘর-বাড়ি তৈরির প্রধান উপকরণ।

ধিমাল পরিবারে একাধিক আলাদা আলাদা ঘরের অস্তিত্ব বর্তমান। তাদের শোয়ার জন্য বড় আকারের একটি ঘর যেমন নির্দিষ্ট রয়েছে তেমনি রান্না-খাওয়ার জন্যও একটি আলাদা ঘর রয়েছে। তাছাড়া ফসল ও গৃহপালিত পশুদের জন্যও আলাদা ঘর ধিমালদের মধ্যে বর্তমান। আবার বাইরের অতিথিদের জন্য ও বসার জন্য ধিমালদের স্বতন্ত্র ঘর রয়েছে যাকে ধিমালরা 'সা' বলে। উত্তরবঙ্গে রাজবংশীদের মধ্যেও বাইরে অতিথিদের জন্য ও গল্পগুজবের জন্য একটি ঘর নির্দিষ্ট রয়েছে যাকে তারা ডাউরী ঘর বলে। আবার প্রত্যেক ধিমাল বাড়ির পূর্বকোণে দেবতার জন্য তিনটি ছোট ছোট ঘর নির্দিষ্ট রয়েছে।

ধিমালদের ঘরগুলি মাঝে উঠান রেখে চারিদিকে চতুর্ভুজের মতো করে সজ্জিত থাকে। ধিমালদের প্রধান ঘরে পরিবারের কর্তা ও গৃহিণী থাকেন। এই ঘরটি মূলত অন্যান্য ঘরের থেকে আয়তনে একটু বড় হয়। আর এই মূল ঘরের পশ্চিম কোণে থাকে ধিমালদের গৃহ দেবতা সা-কো দরি। ধিমালদের প্রধান ঘরটিতে প্রবেশের জন্য আগে একটি মাত্র দরজা থাকত। তবে বর্তমানে ক্ষেত্রসমীক্ষায় দেখা যায় একটিরও বেশি দরজা রয়েছে। তাছাড়া আগে ধিমালদের ঘরগুলিতে বায়ু চলাচলের জন্য কোন জানালা ছিল না। যার উল্লেখ আমরা পাই ১৮৪৭ সালে লেখা হজসন সাহেবের 'Miscellaneous Essays Relating to Indian Subjects' গ্রন্থটির মধ্যে। যেখানে তিনি বর্ণনা করেছেন—

"...house which has no chimney or window." [১১]

তার কারণ হিসেবে বর্তমান ধিমালরা কিছু বলতে না পারলেও অনুমান করা যায় এক সময় উত্তরবঙ্গ ঘন জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল এবং সেখানে বিভিন্ন হিংস্র জীব-জন্তু বসবাস করত। তাছাড়া এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হত এবং এখানকার আবহাওয়াও ছিল ঠাণ্ডা প্রকৃতির। তাই বলা যায় একদিকে হিংস্র জন্তুজানোয়ারদের ভয় অপরদিকে ঠাণ্ডা ও বৃষ্টিপাতের হাত থেকে আরামে থাকার জন্য ধিমালরা ঘরে জানালা রাখত না। শুধুমাত্র ঘরে ঢোকা ও বাইরে আসার জন্য একটি মাত্র দরজা রাখত। আর ঘরের অভ্যন্তর ভাগে দুটি ভাগ করা হত একটি বাঁশের বাতার বেড়া দিয়ে।

আর সেখানেও একপাশে থাকত একটি আলাদা কপাট। তবে বর্তমানে ধিমালদের ঘরগুলিতে জানালার উপস্থিতি লক্ষ করা যায়। এর কারণ হিসেবে বলা যায় একদিকে প্রাকৃতিক পরিবর্তন অর্থাৎ উত্তরবঙ্গে বৃষ্টিপাতের প্রাচুর্য কমেছে, সেই সঙ্গে ঠাণ্ডাও সেই আগের মতো নেই। তাছাড়া বনজঙ্গল কমে যাওয়ায় হিংস্র জীবজন্তুর ভয়ও কমে গেছে। তাছাড়া বাহ্যিকভাবে ধিমালদের জীবনে পারিপার্শ্বিক সংস্কৃতির প্রভাব পড়েছে। ধিমালরা ঘরের চাল বা ছাউনি তৈরি করে ধানের খড় ও নদীর পাশে পাওয়া ছন (লম্বা ঘাস বিশেষ) দিয়ে। আর ঘরের বেড়া তৈরির জন্য তারা মূলত পাটকাঠি, বাঁশের বাতা ও কাশবন ব্যবহার করে থাকে। ঘরের বেড়া যাতে তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে না যায় তার জন্য তারা এঁটেল মাটির সঙ্গে গোবর মিশিয়ে বেড়ায় লেপে দেয়। তাছাড়া বিভিন্ন নদী ও পাহাড় থেকে বিভিন্ন রঙের মাটি এনে মূল ঘরের খুঁটি ও বেড়ায় লেপে দেয়। শুধু তাই নয় মূল ঘরের সামনের দিকে বিভিন্ন চিত্র আঁকেন যেমন— লতা-পাতা, ফুল, ফল, ময়ূর, হাতি, শেয়াল প্রভৃতির। (চিত্র সংখ্যা ঞ্জ ৯ ক, খ) সুতরাং তাদের অলংকারের মধ্যে দিয়েও তাদের অরণ্য ও শিকার প্রীতির পরিচয় ফুটে উঠেছে। ধিমালদের প্রধান ঘরটি উঠান থেকে দু'তিন ফুট উঁচু হয় এবং ঘরের সামনে থাকে চার-পাঁচ ফুট চওড়া একটি বারান্দা। পূর্বে বারান্দার জন্য আলাদা চাল তারা ব্যবহার করত না ঘরের চালের বর্ধিত অংশই বারান্দার ছাউনি হিসেবে ব্যবহৃত হত। তবে বর্তমানে বারান্দার জন্য আলাদ ছাউনি তৈরি করে ধিমালরা। বারান্দার উচ্চতা সাধারণত প্রধান ঘরের মূল ভিটি থেকে সামান্য নিচু থাকে। আর শুধুমাত্র মূল ঘরের সঙ্গেই সাধারণত বারান্দাযুক্ত থাকে। ঘরের মেঝে বর্ষার স্যাঁতস্যাঁতে থেকে মুক্ত রাখতে ধিমালরা মেঝের উপর লম্বা লম্বা ছন (ঘাস বিশেষ) কিংবা খড় দুই স্তরে তিন ইঞ্চির মতো পুরু করে বিছিয়ে তার উপর গোবর মিশ্রিত মাটির তিন-চার ইঞ্চির প্রলেপ দেয়। আবার দু'তিন বছর অন্তর ভেতরের খড়গুলি পঁচে গেলে সেগুলিকে তুলে ফেলে আবার নতুন করে বিছিয়ে দেয়। ধিমালদের ঘরগুলি তারা একান্ত নিজস্ব পদ্ধতিতে তৈরি করে যার জন্য বাইরের লোকের প্রয়োজন পড়ে না। ধিমালদের সমস্ত ঘরগুলিই খড়ের তৈরি। তবে বর্তমানে পার্শ্ববর্তী সমাজ সংস্কৃতির প্রভাবে বাজার থাকা আনা নানা দ্রব্য (প্লাস্টিক, গুনো) ব্যবহারের প্রতিও আগ্রহ দেখা যায়। ধিমালদের রান্নাঘর মূল ঘর অর্থাৎ শোবার ঘর থেকে আলাদা থাকে। এটি আয়তনে মূল ঘরের থেকে অনেক ছোট হয়। এর চাল ও বেড়া সাধারণত খড় ও পাটকাঠি দিয়ে তৈরি করা হয়। তবে বেড়াগুলিতে মাটি ও গোবরের প্রলেপ দেওয়া হলেও খুঁটিতে কিংবা বেড়ায় কোন অলংকরণ করা হয় না।

ধিমালদের আত্মীয়-স্বজন ও বাইরের লোক বসার ও থাকার জন্য একটি করে ছোট ঘর নির্দিষ্ট থাকত। ঐ ঘরটি দেখতে মূল ঘরের মতো হলেও সেখানে কোনো বারান্দা যুক্ত থাকে না।

ধিমালদের ঘরের এক কোণে দেবতার উদ্দেশ্যে তিনটি ছোট ছোট (তিন-চার ফুট লম্বা ও দুই-তিন ফুট চওড়া) ঘর তৈরি করা হয়। তবে এই ঘরগুলির অভ্যন্তরে কোন ঠাকুরের মূর্তি থাকে না। ছোট ছোট মাটির ঢিবিই তাদের দেবতা হিসেবে পূজিত হয়। তাছাড়া মূল ঘরের বিপরীত প্রান্তে গৃহপালিত জীবজন্তুদের জন্যও ধিমালরা ছোট ছোট আলাদা ঘর তৈরি করে। শুয়োর রাখার জন্য বাঁশ ও খড় দিয়ে চাল তৈরি করে দেয় তারা। এখানে সাধারণত বেড়া থাকে না বললেই চলে। থাকলেও সে বেড়া তৈরি করা হয় সুপারি গাছের খোলা দিয়ে। গরু রাখার জন্যও ধিমালরা চাল ও বেড়াযুক্ত ঘর তৈরি করে, যাকে তার 'পিয়াকো সা' বলে। এছাড়াও হাঁস ও মুরগিকে সাপ ও বন্য জীবজন্তুর হাত থেকে রক্ষার জন্য মাটি থেকে বেশ খানিকটা উঁচুতে ছোট ঘর তৈরি করে থাকে যারা তারা 'কিয়া কো খোতার' বলে। এই ঘরটির চাল সাধারণত খড়ের সাহায্যে তৈরি করা হলেও বেড়া তৈরি করা হয় বাঁশের পাতলা বাতা দিয়ে এবং যেখানে সহজেই বাতাস চলাচল করতে পারে।

তবে বর্তমানে ক্রমেই ধিমালদের বস্তুকেন্দ্রিক সংস্কৃতিতে পার্শ্ববর্তী সংস্কৃতির প্রভাব ঢুকে যাচ্ছে। তাছাড়া বিশ্বায়নের প্রভাব তো রয়েছেই। এই দুয়ের প্রভাবে ধিমালদের বস্তু সংস্কৃতি দ্রুত পরিবর্তমান।

■ অবস্তুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতি :

লোকসমাজের বস্তুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির উপাদানের বাইরে যে সমস্ত সৃষ্টি শিল্পগুণ সম্পন্ন সেগুলিই অবস্তুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির অন্তর্গত। এর মধ্যে রয়েছে ছড়া, ধাঁধা, প্রবাদ, লোককথা, লোকসঙ্গীত, লোকনৃত্য, লোকশিল্প প্রভৃতি। তবে আমরা আমাদের আলোচনায় ধিমাল লোকসংস্কৃতির অবস্তুকেন্দ্রিক দিকগুলির মধ্যে লোকসঙ্গীত, লোককথা ও ধাঁধা নিয়ে আলোচনায় অগ্রসর হয়েছি।

লোকসঙ্গীত :

অবস্তুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির একটি বিশেষ দিক হল লোকসঙ্গীত। লোকসাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো লোকসঙ্গীতও লোকমুখে প্রচার লাভ করে ও লোকমাঝে জীবন্ত থাকে।

লোকসঙ্গীতের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন—

"যাহা একটিমাত্র ভাব অবলম্বন করিয়া গীত হইবার উদ্দেশ্যে রচিত ও লোকসমাজ কর্তৃক মৌখিক প্রচারিত হয়, তাহাকেই (folk song) লোকগীতি বলে।"[১২]

লোকসঙ্গীত লোকজীবনের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ এই দুটি দিকের সঙ্গেই অত্যন্ত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। তাই শুধুমাত্র নান্দনিক দিক থেকেই নয় সমাজতাত্ত্বিক ও লোকসংস্কৃতির দিক থেকেও এর গুরুত্ব অপরিসীম। যে কোন লোকসমাজের জীবন-জীবিকা, ধ্যান-ধারণা, আচার-সংস্কার, সুখ-দুঃখের অনুভূতি এগুলির অনেকটাই সঙ্গীতের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। ধিমালদের মধ্যে প্রচলিত সঙ্গীতগুলির মধ্যে দিয়েও তাদের জীবনের নানা দিক ফুটে উঠেছে। এই বৈচিত্র্য অনুযায়ী বিভিন্ন গবেষক ধিমালদের সঙ্গীতকে নানা ভাগে বিভক্ত করেছেন। শেখর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ধিমাল গ্রন্থটিতে ধর্মীয় ও সামাজিক এই দুটি ভাগে বিভক্ত করেছেন। আবার বিশ্বজিৎ রায় তাঁর গবেষণা সন্দর্ভে (অপ্রকাশিত) ধিমালদের নৃত্যগীতকে প্রধানত চারটি ভাগে ভাগ করেছেন—

১. বিবাহ ও ঋতু সম্পর্কিত উৎসব ও অনুষ্ঠানের নৃত্যগীত
২. কৃষিকাজ ও শিকারের নৃত্যগীত
৩. দেবতার উদ্দেশে নৃত্যগীত
৪. অন্যান্য নৃত্যগীত[১৩]

তবে আমরা আমাদের আলোচনায় ধিমালদের সঙ্গীতকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করে নিলাম—

ধিমাল লোকসঙ্গীত

১. আনুষ্ঠানিক সঙ্গীত	**২. অনানুষ্ঠানিক সঙ্গীত**
ক. পূজা-পার্বণের সঙ্গে সম্পর্কিত সঙ্গীত	ক. প্রেমসঙ্গীত
খ. বিবাহ সঙ্গীত	খ. শিকার সঙ্গীত
	গ. ঘুমপাড়ানি সঙ্গীত

১. আনুষ্ঠানিক সঙ্গীত ঙ্ম

কোন অনুষ্ঠানের সময় যে সঙ্গীত পরিবেশিত হয় তাকে সাধারণভাবে আনুষ্ঠানিক সঙ্গীত

বলা হয়। এই অনুষ্ঠানকেন্দ্রিক সঙ্গীতগুলিকে আবার কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হয়। এর মধ্যে রয়েছে পূজা-পার্বণের সঙ্গে সম্পর্কিত সঙ্গীতগুলি।

ক. পূজা-পার্বণের সঙ্গে সম্পর্কিত সঙ্গীত :

ধিমালদের প্রধান অনুষ্ঠান হল গ্রামপূজা, এতে সমগ্র গ্রামবাসী একত্রিত হয়ে পূজা করে। যাকে গ্রাম উৎসবও বলা হয়ে থাকে। তাছাড়া বিভিন্ন ঋতুতে পূজা-পার্বণের সময়ও ধিমালরা সঙ্গীত পরিবেশন করে থাকে। ধিমালদের জীবনের প্রায় প্রত্যেক পর্বেই সঙ্গীত জড়িয়ে থাকলেও বেশিরভাগ সঙ্গীত পরিবেশিত হয় অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে। আর এগুলির বেশিরভাগ গাওয়া হয়েছে দেবতাকে উদ্দেশ করে। আবার কখনো পূজা-পার্বণের সূক্ষ্ম বর্ণনা দিয়ে। কখনো কখনো ধামী দাদুর সঙ্গে তার নাতি-নাতনিদের রঙ্গতামাশা এই আনুষ্ঠানিক সঙ্গীতের মধ্যে দিয়ে ফুটে উঠেছে। নিচে কয়েকটি আনুষ্ঠানিক সঙ্গীতের পরিচয় দেওয়া হল—

ধিমাল :

ধিপ্পা ধিপ্পা ধুয়াং ঢাকে কিহি কিহি পা উনি
দাকাবোনা বোতেংসা বেজান গেলাই লেপিয়াং নানি।
পায়া কিয়া সেতেংসা ধামী আজু
পূজাপাং ঢেরা ঢেরা কো ওয়াজান।
বৈজান খাংলী ভাসি লাং
গ্রাম থানতা এনং বারকা
পাখরী সিং পাঙ্কে মান্তি
ঢাং গাই কিয়া বেজানকো ভাসিং।

হালে বৈকা লাতেংসা কেলাই খাংলি
লাংঙ্কে মনতা চাকা বেজান
দোপা পানে গোয়াই চাঙ্কে।

বাংলা :

দ্রুততালে ঢাক বাজছে কিহি কিহি সুরে বীণা বাজছে
কালো কাপড় পরে আজ যুবতীরা গান করবে।
শুকর মোরগ বলি দিয়ে ধামী দাদু পূজা দেবে

গ্রাম থেকে গ্রাম যুবতীরা আসবে।
গ্রামে এক জায়গায় একটি বড় পাকুড় গাছ আছে
যুবতীর জন্য একটি মোরগ মানত করব।
হাল চাষ করা ছেড়ে দিয়ে আমরা খেতে যাব,
মনে লাগা মেয়েটির সঙ্গে পান সুপারি খাব।

ধিমালদের প্রধান পূজা হল গ্রামপূজা। এই পূজা গ্রামের সমস্ত মানুষের মিলিত প্রচেষ্টায় হয়ে থাকে। আর এই পূজায় পরিবেশিত ধিমালদের এই সঙ্গীতটি থেকে বোঝা যায় তাদের পূজা-পার্বণের জন্য কি কি উপকরণ তারা ব্যবহার করে। মোরগ, শুয়োর যে তাদের পূজার উপকরণ তা এই গান থেকেই বোঝা যায়। আদিম সমাজের মানুষেরা সবকিছুর মধ্যেই শক্তির অস্তিত্ব আছে বলে বিশ্বাস করত। পরে সেগুলিকে দেব-দেবী-কল্পনা করে ভয়ে তাদের খুশি করার জন্য যেমন বিভিন্ন মূল্যবান সম্পদ বিশেষ করে পশু-প্রাণীর মাংস উৎসর্গ করত ধিমালদের মধ্যেও সেই প্রাচীন বিশ্বাস ও সংস্কার আজও পুরোপুরি বর্তমান— তাই তারা তাদের মূল্যবান সম্পদ শুয়োর ও মোরগ বলি দিয়ে দেবতাকে উৎসর্গ করে।

তাছাড়া গ্রামের নারীও যে পুরুষের থেকে কোন অংশে কম নয় তা যুবতীদের গানে অংশগ্রহণের মধ্যে দিয়েই বোঝা যায়। তাছাড়া বিবর্তনের পথে ধিমালরা যে শিকারবৃত্তি ত্যাগ করে বর্তমানে কৃষিকাজে যুক্ত হয়েছে তা এই গানে কৃষিকাজের উল্লেখ থেকেই বোঝা যায়।

গ্রাম পূজায় ধর্মরাজাকে উদ্দেশ্য করে গাওয়া একটি গান হল—

ধিমাল :

সত্যে ধাতেং লোকা ধর্মরাজা
লছমি কো চান্দং কেলাই সত্যে মালাখা।
সত্যে সত্যে দোনু ওয়াজান সত্যে জেওয়ায়া
অসত্যে জেংনু জুমনি তিনওয়া।
সর্বে সায়ো সায়ো, সায়ো
সর্বে সায়ো সায়ো, সায়ো...
বুড়া ঠাকুরা ওয়ারাংকো ঢোলকে সুরদং
ওকো বেসা চৌমাঝি উরনি খেকা দং।

সর্বে সায়ো সায়ো, সায়ো
সর্বে সায়ো সায়ো, সায়ো...

বাংলা :

সত্যযুগ থেকে ধর্মরাজা এসেছে
মা লক্ষ্মীর ছেলে আমরা সত্যকে ত্যাগ করব না।
সৎভাবে চললে তার ফল পরে বুঝতে পারবে।
সর্বে সায়ো সায়ো, সায়ো
সর্বে সায়ো সায়ো, সায়ো...
বুড়া ঠাকুরের ঢোলের সুরে
ভায়রা চৌমাঝির উরণি বাজানোর মত।
সর্বে সায়ো সায়ো, সায়ো
সর্বে সায়ো সায়ো, সায়ো...

এই গানটিও ধিমালদের আনুষ্ঠানিক সঙ্গীত। বিশেষ করে গ্রামপূজার সময় এটি গাওয়া হয়। ধিমাল জনগোষ্ঠীর মানুষকে ধর্মপথে চলার কথা ও সৎভাবে জীবন-যাপন করার কথা বলা হয়েছে এই গানটিতে। তাছাড়া হিন্দুরা সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি নামক যুগ বিভাজনের যে ধারণা পোষণ করে ধিমালরাও হয়তো হিন্দুদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে একই ধারণা পোষণ করতে শুর করেছে। তাই ধিমালরা তাদের দেবতা ধর্মরাজার অস্তিত্ব সম্পর্কে মনে করে সত্যযুগ থেকেই ধর্মরাজা তাদের মধ্যে পূজা পেয়ে আসছে। তাছাড়া এই ধর্মরাজার সঙ্গে হিন্দুদের দেবতা 'ধর্মমঙ্গলের' ধর্মঠাকুরেরও মিল থাকতে পারে। ধিমলাদের বিশ্বাস বুড়া ঠাকুর জগতের সব সুরের স্রষ্টা। তিনি নাচ গানের দেবতা। ধর্মরাজার গান অনেকদিন আগে থেকেই ধিমালদের সমাজে চলে আসছে। চৌমাঝি উরণি দিয়ে বুড়া ঠাকুরের ঢোলের তালে সেও উরণি বাজায়। বুড়া ঠাকুরের প্রতীক ঢাক আর চৌমাঝির প্রতীক হল উরণি। এই গানের মধ্যে দিয়ে ধিমালদের নানা বিশ্বাস যেমন ফুটে উঠেছে তেমনি ধিমাল সমাজে প্রচলিত লোকবাদ্যের পরিচয়ও এখানে ফুটে উঠেছে।

ধিমাল :

দুনিয়া নেলাইকো সংসার নেলাইকো
সোনা সংসার দোং নেলাইকো
কিং মাশাম্মানাবাকো দে

হাইদং কি সোনা মাই খে

পেট ভরী নর্ক সোনা
নুই ভরী থুক
মাগিতেং সোনা
মাগিতেং সোনা
কিং মনুয়া মুরখে সোনা
ইদৈ আজান মুরখ সোনা
ইদৈ আজান মুরখ এং

বাংলা :

দুনিয়া তোমার সংসার তোমার
সোনার সংসারই তোমার
আমরা মানব
আমাদের কিছুই নেই।

পেটপূর্ণ নরক
মুখ ভরা থুতু
আমি অবুঝ
আমি অবুঝ সোনা !

আমরা মানব জাতি মূর্খ সোনা
আমি অবুঝ মূর্খ।
এই অবুঝকে দেখ।

ধিমালরা দেবদেবীকে উদ্দেশ্য করে গ্রাম পূজার সময় এই গান গেয়ে থাকে। তারা বিশ্বাস করে দেব-দেবীর কৃপায়ই মানুষ বেঁচে আছে। তাই তাদের সন্তুষ্ট করতেই ধিমালদের এই গান।

গ্রামপূজার অনুষ্ঠানে গাওয়া আর একটি গান—

ধিমাল :

চাং চাং ধিমচাং পায়াকো পুড়িং ধামী চাং
হাই হাই গোইখে

পূজাতা ওদং খাং হাইকো লাসি
লাসিরে অনে ধিমাল গেলাই পাং

সেতেংসা পায়া কিয়া ধামী
আজুপূজা পাং হাইকো লাসি
লাসিরে অনে ধিমাল গেলাই পাং

ঘিংসে গোরা চুম বেংসা বাংলা গেলাই
লাং হাইকো লাসি লাসিরে অনে
ধিমাল গেলাই পাং

পায়াকো মেতং পাসিংকো টেকা
ধিমাল গেলাই পাং

বাংলা :

খাবে খাবে তাড়াতাড়ি খাবে
শূকরের মাথা ধামী দাদুই খাবে।
কি কি লাগবে পূজায় ওখানে দেখ
আনন্দে ধিমালরা নাচবে।

শূকর মোরগ বলি দিয়ে পূজারী
দাদু পূজা দেবে
আনন্দে ধিমালরা নাচবে।

এই ধরনের বাড়িতে তৈরি হাড়িয়া মদ সহ
আত্মীয়রা আসবে,
আনন্দে ধিমালরা নাচবে।

শূকরের লেজ ও কচি বাঁশের গাঁজা খাবে
আনন্দে ধিমালরা নাচবে।

এই গানটির মধ্যে দিয়ে ধিমাল ধামীর সঙ্গে তার নাতি-নাতনির রঙ্গতামাশা যেমন ফুটে উঠেছে তেমনি দেবতার উদ্দেশে ধিমালদের মধ্যে বিভিন্ন পশুপাখিকে বলি উৎসর্গ করার পাশাপাশি মদও তারা দেবতাকে উৎসর্গ করে তার পরিচয় পাওয়া যায়। তাছাড়া এই গানের মধ্যে

দিয়ে ধিমালদের মধ্যে প্রচলিত কিছু লোকখাদ্যও উঠে এসেছে। ধিমালদের গ্রামপূজায় গাওয়া আর একটি গানে পূজার উদ্দেশ্য ও পূজার সূক্ষ্ম বর্ণনা উঠে এসেছে—

ধিমাল :

ঢাকে ধুইখে ধিমচাং ধিমচাং
তুনজাই উরণি হিংসু।
বাঁশুরীকো ধুন দোখে লোসু সুগমিং লোসু
(দেরাকো পূজাতা, দেরাকো পূজাতা)
আসিষ করলি লোলিংগোই সুগমিং পূজা পালিগোই
(দিরকো থানেকা, জাউরাকো থানেখা)।

পিখে ধামী আজু পাঠ পূজাতা ইউ কিয়া পায়া
পিলি গোইখে দুধে উংথু তুই আতুইসা হায়া।
(পাঠকো পূজাতা দিরকো পূজাতা)
এল পাসং জিয়াকো পূজা, ইউদং আমাং কোঁ
মা এলকা মিশাতুকা গোটেং হোইপাঙ্কে
ঢেরাকো শান্তি জিয়াঙ্কে।

বাংলা :

ঢাক বাজে ধিমচাং ধিমচাং সুরে
তুনজাই ও উরণি শোন
বাঁশির সুর বলছে এসো সবাই এসো
গ্রামের পূজোয় দেবতার পূজোয়।
আশীর্বাদ নিতে আসতেই হবে, সবাইকে পূজা দিতেই হবে
দেবতার স্থানে পিতৃপুরুষের স্থানে।

ধামী (পূজারি) দাদু পাঠ পূজায় মদ মোরগ শুয়োর দিচ্ছে
দিতে হবে দুধ, চাল, কলা, ডিম ও কিছু মাছ
পাঠপূজায়, দেবতার পূজায়।
ভালোভাবে হোক পূজা, মদ পান করব
অমঙ্গল, জ্বর, ব্যথা সবকিছু হটিয়ে দেব
গ্রামে শান্তি হবে, শান্তি হবে।

ধিমালদের এই সঙ্গীতটি থেকে বোঝা যায় ধিমালরা শুধু নিজের মঙ্গল কামনায় নয় সমস্ত গ্রামবাসীর মঙ্গল কামনায় শান্তিতে বাস করার জন্য এবং রোগব্যাধিকে দূরে সরিয়ে দিতেই গ্রামদেবতার শরণাপন্ন হয়। তাদের বিশ্বাস দেবদেবীরাই এই রোগব্যাধি পরিচালনা করে সুতরাং তাদের সন্তুষ্ট করতে না পারলে আর রক্ষা নাই। তাদের মধ্যে প্রাচীন ম্যানা ধারণা আজও পুরোপুরি বর্তমান।

ধিমালদের গ্রামপূজা কোন একটি নির্দিষ্ট দেবতার পূজা নয়। সমস্ত দেবদেবীই পূজা পায় এখানে। যা একটি গানের মধ্যে দিয়ে উঠে এসেছে—

ধিমাল :

হে দান্তা ওয়ারাং পার্বতী চৌমাঝি
ঝারবাড়ি ঝোরা রে বাঙ
(পূজা পাখে দেরাকো যদির ঝারাং)
বুড়া সুব্বা, মহাদেব, রাসতি ধারতি বেরাঙ
খুঁয়া নারিয়া মালাকো বাড়কা ভেলমা
মালাকো বানে দংমা লাকো
(যা তেং চা তেং এলকা)[২] (জিং দং হিয়াকো)[২]
দিরকোং শক্তিতা দির কোং শক্তিতা
(ঝারবাড়ি হানিনু এংযা নেনাকো, হায়া মাংলি
হানিনু হায়া নেনাকো)
চাম-চামদি এলকা চাতেং হিয়াকো,
নাং কোং আশিকতা, চামদি গেলাই
(নাংকো আশিকতা)[২]
নাদং আবা আমা নাদং সংসার
নাং মা খাংনু (হাসু খানাং আর)[২]
নাদং আবা আমা নাদং সংসার
নাং মা খাংনু (হাসু খানাং আর)[২]
এডে ডেনোইতা এদং ডেনোইতা,
ডাহিনী-যুগনী মা এলকা ঢেরাতা দুঃখ পাকা
ঢাপিমু নাংকোং শক্তিতা।

চামদি গেলাই নাংকোং শক্তিতা।
পিসু শক্তি কেলা এং বেতেং উরণি খেতেং
বাছার-বাছার পূজা তাতাংকে।

বাংলা :

হে দান্তা ওয়ারাং পার্বতী চৌমাঝি
জঙ্গল নদীগুলি—
পূজা করছি গ্রামের সকল দেবতার
বুড়াসুব্বা, মহাদেব, বাসতি ও পৃথিবী মাতার
বাঘ হাতি না আসুক, ঝড় বন্যা না হোক
খেয়ে, খেলে জীবন যেন ভালো থাকে,
দেবতার শক্তি, দেবগণের শক্তি
জঙ্গলে গেলে হরিণ যেন পাই
মাছ ধরতে গেলে মাছ যেন পাই
সন্তানসন্ততি যেন ভালো থাকে।
হে দেবতাগণ তোমাদের আশির্বাদে।
তুমি পিতা তুমি মাতা, তুমি সংসার
তুমি না দেখলে কে দেখবে আবার—
এই মাটিতে এই মাটিতে।
ডাকিনী যোগিনী অনিষ্টকারী গ্রামের দুঃখকারিণী
তাড়িয়ে দাও তোমাদের শক্তিতে,
হে দেবতাগণ তোমাদের শক্তিতেই।
আমাদের শক্তি দাও,
আমাদের ভালো থাকার মূলে
খেয়ে দেয়ে ঢাক বীণা বাজিয়ে বছর বছর
তোমাদের পূজা যেন রাখতে পারি।

এই গান থেকে খেয়ে পড়ে ভালো থাকার ইচ্ছাই প্রকাশ পেয়েছে। তারা মনে করে পার্থিব সুখ ভোগের মূলে দেবতাদেরই হাত রয়েছে। ধিমালরা বিশ্বাস করে দেবতাদের মধ্যে কিছু কিছু দেবতা শুধুমাত্র অনিষ্ট করে তার ফলেই সমাজে নানা রোগব্যাধি অশান্তি ও মহামারি দেখা দেয়। আর অনিষ্টকারী দেবদেবীকে দেবতারাই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে মানুষের সে ক্ষমতা নেই।

খ. বিবাহ সঙ্গীত :

ধিমালদের বিবাহে লোকাচারের যেমন বৈচিত্র্য রয়েছে তেমনি সঙ্গীতেরও নানা বৈচিত্র্য আছে। ধিমালরা বিবাহের বিভিন্ন পর্যায়ে সঙ্গীতের পরিবেশন করে থাকে। ধিমালরা যখন বরযাত্রী সহযোগে মেয়ের বাড়িতে এসে উপস্থিত হয় তখন হিন্দু বাঙালিদের বিবাহের মতোই তাদের প্রবেশ পথ আটকানো হয়। সেখানে ধিমালরা তিনটি ধাপে আটকায়। প্রথমে ছেলেরা, পরে মেয়েরা, অবশেষে বৃদ্ধরা। আর এখানে বর ও বরযাত্রীদের প্রশ্ন করে হাস্যকৌতুক গানের মধ্যে দিয়ে। এই রকম একটি যুবকদের গাওয়া গান হল—

ধিমাল :

হেসো সং লোহিনে, হেসো হানানে
ওআনাউ সোনা, হেসো হানানে
মাছেহানু কেলা এং মা পিয়াখ দামা
ও আনাউ সোনা ও আনাউ সোনা
লেহিনে লেহিনে হাই হাই চুমাইনে
কমর ধোতেংসা লেহিনে সোনা
গোইনু দামা ধাইসু ধাইসু
ওদং বুঝিস-কমর ধোতেংসা
লোসু দাদা সোনা লোসু
সাকো ইউ গোরা তোলা আপা আমসু
হে বোতল চুমই না ইউ
খোপসু খাং পাসু

বরযাত্রীদের আটকে যুবতীদের গাওয়া একটি গান হল—

এ দপাং হায়া মাংঘাই খে
এ দপাং চি নাচলি হাঘাইখে
যুরিতে হানেরে যুরিতে হানেরে
নাংকোং সাতা রিমে ইহি
ওয়েদং তাসুরে ওয়েদং তাসুরে
রেঝকা বেজান কেলাইকো পিয়াংকারে
মা রেমকা ওয়াজান

গুরুপাতেং চুমাসুরে।

বাংলা :

একসঙ্গে মাছ ধরেছি, একসঙ্গে জল এনেছি,
তাকে ছাড়িয়ে নিতে এসেছ?
তুমি ফিরে যাও, তুমি ফিরে যাও
তোমার লজ্জা করে না।
তোমার ঘরে তোমার বোন আছে তাকে রেখো
আমাদের সুন্দর মেয়ে দেব না।
তোমাদের কুৎসিত যুবককে
ফিরিয়ে নিয়ে যাও।

যুবক ও যুবতীদের গাওয়া গানে বরকে সামান্য রঙ্গচ্ছলে বিদ্রূপ হানলেও বৃদ্ধদের গানে সেই সুর মিলিয়ে গেছে। তারা সান্ত্বনার প্রলেপ দিয়ে গেয়ে ওঠে—

ওয়াজান কো কাথালাই
বেজানকো কাথালাই
দোহি হাই হা হাই
মাহাপাসু মাহাপাসু মনসোং মহাপাসু
সংস্কৃতি রীতিনীতি তানু তানু তাসু
কালছিলে গোরাপানে গুয়াই
কোলাই দোপাচানু

বাংলা :

যুবকদের কথাগুলি
যুবতীদের কথাগুলি
কে কি বলছে
ভুলে যাও মন থেকে ভুলে যাও।
সংস্কৃতির রীতি-নীতিগুলি রাখতে হবে,
কলসের মদ, পান সুপারি
আমাদের সঙ্গে খেতে হবে।

শুধু তাই নয় বিবাহের আসরেও গাওয়া হয় একাধিক গান। এরকম একটি গান হল—

ধিমাল :

লোকতেং লোহিনা ভোমরাকো রূপ হৈ
হে জুয়াই চেলা কিং খেতি বাড়িতাং।
কিং কোথে বাড়ি তা
এ থোংগে বাঢ়তো।

ভোমরাকো রূপ হৈ
ঘুরাইলি ফিরাইলি
লোহিনা জুয়াই চেলা
তাইকো খোর বাড়ি তা

শোরী চেলী নং
সা সোল্লা পালি এং
বাজী খুশি জেংহী

ধানীকো চেলী এং
বিমৌলী বনাই খে
খরতেং নুই তেং
খাতেং মালাকো

বাংলা :

ভোমরার রূপে তুমি এসেছ জামাই
আমার ফুল বাগানে
আমার বাগানের একটি ফুলের জন্য।

ভোমরারূপে এসেছ ঘুরতে ফিরতে
এসেছ জামাই আমার বাগানে।

নিজের মেয়ের মত ও সহমতিরূপে
গ্রহণ করলাম,
মেয়েকে বাধ্য কর না
কান্নাকাটি করে থাকে
দেখ পালিয়ে না আসে।

এই সঙ্গীতটি গাওয়া হয় ধিমালদের বিবাহ আসরে। বরযাত্রীরা যখন বিবাহ আসরে পান সুপারি মদ দিয়ে তাদের মেয়েকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রার্থনা জানায় তখন মেয়ের বাবা ও প্রতিবেশীরা সবাই মিলে উপরোক্ত গানটি পরিবেশন করে থাকে। আসলে এই গানের মধ্যে দিয়ে যৌনতার অনুষঙ্গ প্রকাশ পেয়েছে। আসলে বিবাহ নামক সামাজিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দিয়েই যে যৌনতার ছাড়পত্র দেওয়া হয় এই বিষয়টিই এখানে গানের মাধ্যমে তুলে ধরা হয়েছে। মেয়ের প্রতীক হল এখানে ফুল আর ছেলে হল ভ্রমর। তাছাড়া বাহ্যিকভাবে ফুল সবার কাছেই প্রিয়। তাই মেয়ে তার বাবার বাড়িতে ফুলের মতোই যত্নে ও আদরে ছিল। তাই শ্বশুর বাড়ি অর্থাৎ বরের কাছে গিয়ে মেয়েকে যাতে নির্যাতনের শিকার হতে না হয় সেইদিক দেখে রাখার জন্য মেয়ের বাবা তার জামাইকে সচেতন করে দেয়।

আবার বিয়ে শেষে বর যখন বউকে সঙ্গে নিয়ে বাড়ি ফেরার আগে শ্বশুরের কাছে আশীর্বাদ নিতে যায় তখন তার কণ্ঠেও গীত হয়—

ধিমাল :

নিং আশীর্বাদ মো
যুগ যুগ চালি সোন
যুগ যুগ আমলী।

নিনাকো সসুরাজা
নিং পাখরি সিংকো শায়াতা
ইয়োম তেং সং কিয়ে সোনা।

বাংলা :

আপনার আশীর্বাদে
যুগ যুগ ধরে খেয়ে পড়ে যেতে পারি—
পান করতে পারি।

শ্বশুর রাজা (শ্বশুর) আপনার পাকুড়
গাছের ছায়ায়
যেন বসে থাকতে পারি।

এই গানের মধ্যে দিয়ে জামাই তার নব দাম্পত্য জীবন শ্বশুর মশাইয়ের আশীর্বাদ নিয়েই শুরু করতে চান। তাছাড়া তার আশীর্বাদ যেন বট গাছের মতোই দীর্ঘদিন তাদের উপর থাকে— এই প্রার্থনা প্রকাশ পেয়েছে।

ধিমালদের মধ্যে পালিয়ে বিয়ে করার প্রাচীন রীতি আজও বর্তমান। তাই একজন প্রেমিক তার প্রেমিকার উদ্দেশে গায়—

ধিমাল :

ও আনাউ সোনা ও আনাউ সোনা
নাংকো মনত জুমনী আউলা উনাউ
দো পাংকা সানাইতি আমা লাইখে
আই তিংহি আনাউ সোনা কাংকো কাপালতি...
নানি কো তিং তিং জুমনি মামাতিং
লোকা গেলাই এনিকো ভাসিং
ও আনাউ সোনা ও আনাউ সোনা
নাংকো মনত জুমনি আউলা উনাউ...
তোলেদং বোকানা এংলি গোয়ানা
কাংকো ভাইকা ওয়াজান এং গোলি গোয়ালা
ও আনাউ সোনা ও আনাউ সোনা
নাং কো মনত জুমলি আউ-লাউ-নাউ।

বাংলা :

ও আমার সোনার সাথি, ও আমার সোনার সাথি
মন তোমার কাল আলুথালু হয়ে যাবে...।
মাথায় সোনার টিকলি পরে আমার মা,
তখন তোমার কপালে পরানো হবে তা
আজকেই তোমাকে, কাল কিন্তু না
যারা এসেছে আর তারা ফিরে আসবে না।
ও আমার সোনার সাথি, ও আমার সোনার সাথি
তোমার মন কাল আলুথালু হয়ে যাবে।

পিঠে বানাতে হলে ছাঁকনি দিয়ে (চালের গুঁড়ো) ছাঁকতে হবে।
আমার মত যুবককে পাওয়ার জন্য তোমাকে অনেক খুঁজতে হবে।
ও আমার সোনার পাখি, ও আমার সোনার সাথি
তোমার মন কাল আলুথালু হয়ে যাবে...।

২. অনানুষ্ঠানিক লোকসঙ্গীত :

ধিমাল জনজাতির লোকেরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে যেমন নানা সঙ্গীত পরিবেশন করে থাকে তেমনি এর বাইরেও নানা ধরনের সঙ্গীত পরিবেশন করে। যেমন— প্রেম সঙ্গীত, শিকার সঙ্গীত, ঘুমপাড়ানি সঙ্গীত প্রভৃতি।

প্রেম সঙ্গীত :

প্রেমকে অবলম্বন করে বিভিন্ন লোকসমাজে অসংখ্য সঙ্গীত রচিত হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে উত্তরবঙ্গে প্রচলিত ভাওয়াইয়া গানের কথাই বলা যেতে পারে। ধিমালদের মধ্যেও দেখা যায় যুবক-যুবতীরা উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক সঙ্গীতের মাধ্যমে তাদের প্রেম ভাবনা ব্যক্ত করেছে। এরকমই একটি সঙ্গীত হল—

ধিমাল :

চেনসে কো বার সানাই মেনসেকো বার (২)
চান : চুমাসুরে আনাও সাবাল লোকেন্তোকো বার (২)
সর্বে সায়ো সায়ো, সায়ো
সর্বে সায়ো সায়ো, সায়ো...।
চামদি : চেনসে কো বার সানাও মেনসেকো বার (২)
দামা বৈকা রৈদং বাগুরী (২)
চুমাসুরে আনাও সাবাল জোরদং হাসুলি (২)
সর্বে সায়ো সায়ো, সায়ো...।
জোর জোর দং গোমনা জোরদং বাসুরী
চুমাসুরে দাদা সাবাল জোরদং হাসুলি
সর্বে সায়ো সায়ো, সায়ো
সর্বে সায়ো সায়ো, সায়ো...।

চান : হোকলাদং মিলি মিলি পয়া হায়াতিলি
পয়া হায়া মাতিনুতে কাংকো দপাতি।

চামদি : হায়া মাংকো মাংকো তাং সিঙি ঢুসাহি
হায়া মাংলা মাডোংখা দাদা আংলি তুসাহি
সর্বে সায়ো সায়ো, সায়ো...।

বাংলা :

ছেলে ঞ্ম সাথি সরষের ফুল না শিমের ফুল (২)
সাথিরা শিমুলের ফুল নিয়ে এসো (২)
সর্বে সায়ো সায়ো, সায়ো
সর্বে সায়ো সায়ো, সায়ো...

মেয়ে : রাস্তায় রাস্তায় কুল পেকে আছে
সাথিরা জোড়া জোড় হাঁসুলি নিয়ে এসো
সর্বে সায়ো সায়ো, সায়ো (২)
একজোড়া গোমনা, এক জোড়া বাঁশি
দাদা এক জোড়া হাঁসুলি নিয়ে এসো
সর্বে সায়ো সায়ো, সায়ো...

ছেলে : ঘন হোগলা বনে পয়ামাছ, চল মারতে যাই
ধরতে যদি না চাও, তবে আমার সঙ্গে চলো

মেয়ে : মাছ ধরতে পারবো না দাদা আঙুলে ব্যথা লেগেছে
সর্বে সায়ো সায়ো, সায়ো...

খ. শিকার সঙ্গীত :

ধিমালরা বর্তমানে পার্শ্ববর্তী সমাজের প্রভাবে পুরোপুরি কৃষিজীবী হয়ে উঠলেও কিছুদিন আগে পর্যন্ত অর্থাৎ উত্তরবঙ্গে ইংরেজ আসার পূর্বেও তারা বনে জঙ্গলে জুমচাষ ও শিকারের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করত। বর্তমানে ভারতীয় ধিমালরা বছরের একটি নির্দিষ্ট দিন (চৈত্র সংক্রান্তি) ছাড়া আর শিকারে বের হয় না। শিকার করা প্রায় ভুলেই গেছে। তবে তাদের স্মৃতি থেকে তাদের হৃদয়ের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা শিকারের সঙ্গীত আজও ভোলেনি। তাই বিভিন্ন সময় আজও তারা শিকারের গান পরিবেশন করে থাকে; যেমন—

হো হো পাতেংসা কেলাই
শিকার পাখে পার্ব্বাণো পূজাতো বাংলা খা খে
খার ধেনুক মাহালে চুমতেংমা লোসু
শিকারী খিয়া গোলাএং কাইতেং চুমাসু
কোয়াইহি ডেনেড্রোতে হুম তেংসা
পিখা চি আমলি খিহি
লেউসী চি আমখা
শিকার পাইখে কোয়া রুহা
তিসু সিতা হাঙ্কে
কালছিকো দাকা গোরা ফুংতেং বিহা চাঙ্কে...

বাংলা :

হো হো করে আমরা শিকার খেলতে যাই
পূজা পার্বণে আত্মীয়তা করতেও যাই।
তীর ধনুক নিয়ে এসো শিকারী
কুকুরগুলি ডেকে আনো।

গুইসাপ গাছে কোটরে আছে
আমি নিঃশ্বাস নিয়ে বুঝেছি,
পিপাসা লেগেছে লতার জল খাচ্ছি।
শিকার তো করলাম গুই সাপ,
খরগোশ নিয়ে চল বাড়ি যাই।
কলসীর মিষ্টি চোলাই ও মাংস পুড়িয়ে খাই।

ধিমালরা বর্তমানে বনজঙ্গলের অভাবে শিকার বন্ধ করলেও মাছ ধরার নেশা আজও তাদের মধ্যে পুরোপুরি বর্তমান। তাই আট বছরের বাচ্চা থেকে আশি বছরের বৃদ্ধ-বৃদ্ধা পর্যন্ত দল বেধে মাছ ধরার নেশায় ছুটে যায় বিভিন্ন নদী ও খাল বিলের মধ্যে। মাছ ধরার এই বর্ণনা উঠে এসেছে ধিমালদের একটি গানে—

ধিমাল :

তিসু সিতা হাঙ্কে ভায়া গেলাই

তিসু সিতা থাঙ্কে
হোকলা কো মিলিমিলি পয়া হায়াতিলি
হিংসা হায়া নিংনু আনাউ কেং সাতুইসা পিলি
হায়া মাংকা মাংকা তাং শিঙ্গি ঢুসাহি
হায়া মাংলি মা জোংকা কাকা সাংলি তু সাহি।

বাংলা :

চল, সঙ্গীরা চল আনন্দে
চল সঙ্গীরা চল।
হোকলার সঙ্গে মিশে আছে পয়া নাম ধারী মাছ,
অনেক মাছ পেলে আমাকে কিছু দিও।
মাছ ধরতে ধরতে শিঙ্গি মাছ বিঁধেছে,
মাছ ধরতে পারছি না আঙুল ব্যথা করছে।

ধিমাল :

হামিং হামিং টেংনা গাপা গাপা
এতাশে নাসিংতা লোসিংতা তা পাকা
জিমারে কাং কো নুনু সিকাপা জিমা
ঝাড়বাড়ি সং লোখে নেকেড়া খুঁয়া জিম
খারখে নুনু জামাল চুমারে খুঁয়া চুমা
সিকাপা নুনু সিকাপা জিমরে জিমা।

বাংলা :

বার হচ্ছে, ঢুকছে- ট্যাংরা মাছ বিঁধছে রে বিঁধছে
এখানকার নিশ্বাস ওই শিমূল অবধি যাচ্ছে
ঘুমোও রে বাচ্চা, চুপ করে ঘুমোও
বন থেকে নেকড়ে বাঘ আসছে
বাচ্চারা সব কাঁদছে, বাঘ তুমি নিয়ে যাও
চুপ করে ঘুমোও সোনা, চুপটি করে ঘুমোও।

গ. ঘুমপাড়ানি সঙ্গীত :

যেকোন লোকসমাজের পুরুষ ও মহিলাকে দিনভর সংসারের নানা কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। তাই শিশুকে যেন তেন প্রকারে ঘুম পাড়িয়ে রাখাটা একান্ত আবশ্যক। তাই বিভিন্ন লোকসমাজে শিশুকে ঘুম পাড়ানোর জন্য যেমন কিছু ছড়ার আবৃতি করা হয় তেমনি কিছু কিছু সঙ্গীতও পরিবেশন করা হয়। বাচ্চাদের পরিচর্যার ক্ষেত্রে নারীদের ভূমিকাই প্রধান। তাই নারীর কণ্ঠে বিশেষত মা, দিদি, পিসি, মাসিরাই এই গান করে থাকেন। ধিমালদের মধ্যেও শিশুকে ঘুম পাড়ানোর জন্য ঘুমপাড়ানি সঙ্গীতের প্রচলন আছে। যেমন—

ধিমাল :

লই লই দই দই পিয়াংকে
লোহই রে লোহই
জিমারে অনে জিম
নেকোড় লোখে
লই লই দই দই জিমরে অনে জিম।

বাংলা :

দোলে দোলে দোলে
এল এল এল
ঘুমোরে বাছা ঘুমো
নেকড়ে বাঘ এল
দোলে দোলে ঘুমো ঘুমো।

ধাঁধা :

লোকসঙ্গীতের মতোই অবস্তুকেন্দ্রিক লোকসংস্কৃতির একটি বিশেষ শাখা হল ধাঁধা। এই 'ধাঁধা' কথাটির উদ্ভব নিয়ে লোকসংস্কৃতিবিদ্‌দের মধ্যে নানা মত প্রচলিত আছে। তবে বেশির ভাগ সমালোচকেরাই মনে করেছেন 'দ্বন্দ্ব' শব্দটি থেকে ধাঁধা কথাটির উদ্ভব। অনেকে আবার সংস্কৃত 'প্রহেলিকা' শব্দের সমার্থক হিসেবে ধাঁধাকে দেখেছেন। এই ধাঁধা স্থানভেদে আলাদা আলাদা নামে পরিচিত। এমনকী বাংলা ভাষা অধ্যুষিত পশ্চিমবঙ্গেরই বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন নামে

পরিচিত। যেমন— কোচবিহারে ‘ছিলকা’, পুরুলিয়ায় ‘বাতকথা’ ইত্যাদি। ধাঁধার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে অনেকেই বলেছেন, যে বাক্য দ্বারা একটি মাত্র ভাব রূপকের আশ্রয়ে জিজ্ঞাসাকারে প্রকাশ পায় তাকে ধাঁধা বলা হয়।

ধাঁধার মধ্যে দিয়ে বুদ্ধির অনুশীলন ও জ্ঞানের চর্চা করা হলেও এটিই এর প্রধান লক্ষ নয়। খেলাচ্ছলে প্রশ্ন উত্তরের মাধ্যমে একদিকে যেমন অবসর বিনোদন তেমনি আবার নির্মল হাস্যরস সৃষ্টি করাই এর প্রধান উদ্দেশ্য। এই হাস্যরস দৈনন্দিন জীবনের পরিচিত ও প্রয়োজনীয় যেকোন বিষয়কে অবলম্বন করে হয়ে থাকে। ধাঁধার উৎপত্তি কবে হয়েছিল এ নিয়ে সমালোচকদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেছেন এর উৎপত্তি আদিম সমাজে, আবার কেউ কেউ বলেছেন ধাঁধার জন্য যে সূক্ষ্ম বুদ্ধির প্রয়োজন তা কখনোই আদিম সমাজের মানুষের মধ্যে ছিল না। আশুতোষ ভট্টাচার্যও প্রাচীন সমাজে ধাঁধার উৎপত্তি- এ ধারণাকে মেনে নিতে পারেননি। তাই তাঁর উক্তি—

> ‘‘ধাঁধার মধ্যে যে সূক্ষ্ম বুদ্ধি এবং চিন্তার যে অনুশীলন হইয়া থাকে, তাহা নিতান্ত আদিম জাতি সুলভ বলিয়া মনে করা যাইতে পারে না। ...সেইজন্য প্রকৃত আদিম সমাজ বলিতে যাহা বুঝায়, তাহাতে ইহাদের উদ্ভব হয় নাই।’’[১৪]

ধাঁধার উদ্ভব একেবারে আদিম সমাজে না হলেও ধাঁধার উল্লেখ বহুদেশের বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায়। ভারতীয় প্রাচীন গ্রন্থ ‘ঋকবেদ’-এ যেমন এর উল্লেখ পাওয়া যায় তেমনি বাংলা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন চর্যাপদের মধ্যেও ধাঁধার উল্লেখ রয়েছে। ধাঁধাকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সাহিত্যিক ধাঁধা ও লৌকিক ধাঁধা। ধিমালদের মধ্যে সাহিত্যিক ধাঁধার তেমন উল্লেখ পাওয়া যায় না। ধিমালদের মধ্যে প্রচলিত ধাঁধার সমস্তই লৌকিক জীবন থেকে উঠে এসেছে। ধিমালদের মধ্যে প্রচলিত ধাঁধাগুলিকে বিষয় অনুসারে নিম্নলিখিত কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত করে আলোচনা করা যেতে পারে—

ধাঁধা

- ক. পশুপাখি ও পতঙ্গ বিষয়ক
- খ. গাছপালা, ফল-ফুল বিষয়ক
- গ. গৃহস্থালি বিষয়ক
- ঘ. মানুষের শরীর সম্পর্কিত ধাঁধা
- ঙ. অন্যান্য বিষয়ক

ক. পশুপাখি ও পতঙ্গ বিষয়ক ধাঁধা :

ধিমালরা বর্তমানে বিবর্তনের পথে স্থায়ীভাবে বসবাস করলেও কয়েক বছর আগে পর্যন্ত তারা বনে জঙ্গলে যাযাবরের মতো ঘুরে বেড়িয়ে ও পশুপাখি শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করত। তাই বন্য বিভিন্ন পশুপাখি, জীবজন্তুকে আশ্রয় করে আজও অজস্র ধাঁধা তাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে ঘুরে ফেরে, যেমন—

ধিমাল :

দিনতা পাতালতা ফিনু,
ওয়াংখে অলিখে আহার ভোনু— হাই? —চুনচেলেং

বাংলা :

আকাশে ঘর পাতালে দুয়ার
বের হয় ঢুকে খুঁজতে আহার— কাই? —বাবুই পাখি।

ধিমাল :

ডিয়ালং খোকোই এনং চাং
ঝার বাড়ি সং লোখে খাংরে খাং— হাই?— লাইয়া

বাংলা :

চারটি পা একটি শিং
জঙ্গল থেকে আসছে দেখে চিনে নিন— কি? —গণ্ডার।

ধিমাল :

পুড়িংকো লেতা নেহেনং ডাং মটোকা লাঠি মাঝাতা।
হাসুকো কাথা মা হিংখে হিগিলকে তাইকো ধুনতা— হাই? —নারিয়া

বাংলা :

মাথার নীচে দুটি শিং, মধ্যে মোটা লাঠি
কারো কথা শোনো না চলে আপন মনে হাটি— কি? — হাতি।

ধিমাল :

একচোর বিকাইনু সুগমিং রিকাই খেৎ

খোতারতা ওয়াংনু খুতেং চুমখে— হাই? —শিয়াইলে।

বাংলা :

এক চোর ডাকলে সাত চোর ডাকে,

খাঁচায় ঢুকলে চুরি করে থাকে— কি? —শেয়াল।

ধিমাল :

নিশ্চিন্তা ওয়া চাগিলখে,

লিপাং মি উলটাইতেং নিন ধাখে— হাই? —ভোতো।

বাংলা :

রাতেও ঘুরে বেড়ায়,

দিনে চোখ খুলে ঘুমায়— কি? —খরগোস।

ধিমাল :

দিয়ালং খোকোই খোর মর পাখে

তাইকো সাতা পুড়িং মোহো চাখে— হাই? —পানিহায়া।

বাংলা :

চার পা খস্ খস্ করে

নিজের ঘরেই মাথা লুকোতে পারে— কি? —কচ্ছপ।

ধিমাল :

এলং বেবাং হাটে হাটে হান্দিখে

ক্যার থান্তেং ফিউ পিখে— হাই? —চুদুর

বাংলা :

একলা বুড়ি হাটে যায়

আমাকে দেখে দুয়ার দেয়। —কী? —শামুক

ধিমাল :

পুড়িংতা ইহি ডালে কুনিং ওয়ামাকো সিং

ভেরমা মাকো ঢাখে ভেরমা কুনিং। —হাই? —এলখা।

বাংলা :

মাথায় আছে শাখা প্রখাশা নয়তো সেটা গাছ

বাতাস নয় বাতাসের মতো দৌড়বাজ। —কি? —হরিণ।

ধিমাল :

কম্বল মাকো বামকা হিগিলখে গেলগুলকা

তাইকো মনতা ঘুরি গিলখে থোচি সিথে থুথু পা। —হই? —নাইবুড়ি।

বাংলা :

কম্বল নয় মোটা বেড়ায় হেলে দুলে।

আপন মনে ঘুরে বেড়ায় থুথু ফেলে। —কি? —ভাল্লুক।

ধিমাল :

ম্মসিকো সা ঝারবাড়ি, কাংকো ঢেরাতা

মালোখে লাহাচিতেং কাং কোতা। —হাই? —খুয়া।

বাংলা :

মাসির বাড়ি জঙ্গলে আমার বাড়ি গ্রামে

আসতে পারে না মাসি ভয়ে আমার এখানে। —কি? —বাঘ।

ধিমাল :

ঝার বাড়িতা হিখে টাংগিলখে সিংতা

নেনহিয়া উমকুনিং নামখে মলমলকা। —হাই? —নেনহিয়া খাটাস।

বাংলা :

জঙ্গলে থাকে গাছেও চড়ে

নুনিয়া ধানের মতো গন্ধ করে। —কি? —বেজির মতো দেখতে গন্ধযুক্ত পশু।

ধিমাল :

রাজাকো চামদি চাখে আমখে নিনধাখে

কদল মাস্তু ভোনোই তোখে। —হাই? —পায়া।

বাংলা :

রাজার মেয়ে খায় দায় ঘুমায় ঘরে

কোদাল ছাড়াই মাটি খুঁড়তে পারে। —কি? —শুয়োর।

ধিমাল :

এনং বেজান লিপাং

জালে পুইখে। —হাই? —মাকড়া।

বাংলা :

বুড়ির এমন হাল

সারাদিন বুনে জাল। —কি? —মাকড়সা।

ধিমাল :

লেতা বার রুহুতা বার

সালেংতা হিগিলখে বাংসাকো সার। —হাই? —কিয়া।

বাংলা :

তার নিচে ফুল উপরে ফুল

আঙ্গিনায় ঘুরছে আত্মীয়দের সবজি বলে না করে ভুল। —কি? —মুরগি।

ধিমাল :

সাধু মাকো মুইসুইহি দাই দাইকা,

মল মলকা চুইতি মাস্তু কলাবু মলমলকা। —হাই? —বোকরা মেছা।

বাংলা :

সাধু নয়কো লম্বা দাঁড়ি

সুগন্ধি তেল নয়কো গন্ধ ভারি। —কি? —পাঁঠা ছাগল।

ধিমাল :

হিয়ালী মাধিরহি হিয়াখে এলকা, খাংনু দিনতা দাকায

খাংনু ওকো হেয়াকা মনজিং খে এলকা। —হাই? —খোজ্জা।

বাংলা :

নাচ শিখেনি নাচে ভালো, আকাশ দেখলে কালো

তার নাচ দেখলে মনে লাগে ভালো। —কি? —ময়ূর।

ধিমাল :

সা ইহিতে ফিনু মান্থু। —হাই? —তুই।

বাংলা :

ঘর আছে তো দরজা নাই। —কি? —ডিম।

ধিমাল :

মে মাকো তিখে

এতাং ওতাং উরাই গিলখে। —হাই? —অংলাইতি।

বাংলা :

আগুন নয় জ্বলে

যেখানে সেখানে উড়ে চলে। —কি? —জোনাকি।

খ. গাছপালা ও ফল-ফুল বিষয়ক :

ধিমাল :

রুহুতা চামিন্দি মলমলখাহি,

লেতা খুতেং ঢুহি। —হাই? —দামসে।

বাংলা :

উপরে থাকতে সুন্দর বাস,

নিচে পড়লেই সর্বনাশ। —কি? —কাঁঠাল।

ধিমাল :

আমা চিখরিউ, চান পোলো লোইকা। —হাই? —মারচি।

বাংলা :

মা কুৎসিত ছেলে সুন্দর। —কি? —পাকা লঙ্কা।

ধিমাল :

এনংদং ডিহা ইন্তুং ইহি পিয়া। —হাই? —কুমড়া।

বাংলা :

একটি সুতোয় অনেক গরু। —কি? —কুমড়ো।

ধিমাল :

ঝুলিতেং ইহি ইস্তুং বেবাং

খসরুকা চামড়া খাংরে খাং। —হাই? —লুচি।

বাংলা :

ঝুলে আছে অনেক বুড়ি,

তার গায়ে খুসুরী। —কি? —লিচু।

ধিমাল :

মিহিকাতা ঢাবা হুংকা,

বাঢ়কা জেংনু ঢাবা লাপাকা। —হাই? —পাসিং।

বাংলা :

ছোটতে কাপড় পড়া,

বড় হলেই কাপড় ছাড়া। —কি? —বাঁশ।

গ. গৃহস্থালির কাজে ব্যবহৃত আসবাবপত্র বিষয়ক ধাঁধা :

দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় গৃহস্থালির কাজে ব্যবহৃত নানা জিনিসকে আশ্রয় করেও ধিমালদের ধাঁধার উৎপত্তি চোখে পড়ে। যেমন—

ধিমাল :

কেং ঘুরাইনু এলকা জিয়াং

মাঘুরাইনু সাকাং। —হাই? —ইয়াসু।

বাংলা :

আমাকে ঘোরালে ভালো হয়

না ঘোরালে গরম বয়। —কি? —পাখা।

ধিমাল :

সিংকাতা পেতেতেকা মিংনু সিন্দুর। —হাই? —ভোনই কো কালছে।

বাংলা :

কাঁচা থাকতে নরম, পাকলে শক্ত। —কি? —মাটির কলসি।

ধিমাল :

ডুবিতেং ওয়া চি আমখে,

লোহোনু ওয়া চি ওখে। —হাই? —জলটিংটি।

বাংলা :

ডুবলেই জল খায় উঠলেই ওগলায়। —বালতি।

ঘ. মানুষের শরীর সম্পর্কিত ধাঁধা :

মানুষের দেহকে কেন্দ্র করেও ধিমালদের মধ্যে বেশ কিছু ধাঁধা প্রচলিত আছে। যেমন—

ধিমাল :

এনং সা কো নেহানং দুয়ার। —হাই? —নাঁহপু।

বাংলা :

এক ঘর কিন্তু তার দুই দুয়ার। —কি? —নাক।

ধিমাল :

এনাং হান্দিহি এনাং লোহি। —হাই? —মি।

বাংলা :

এখনই গেল, এখনই এল। —কি? —চোখ।

ঙ. অন্যান্য বিষয়ক ধাঁধা :

ধাঁধার বিষয়কে নির্দিষ্ট ছকে ফেলে তার শ্রেণি বিভাগ করা কঠিন। তাই যেগুলিকে কোন বাঁধা ছকে ফেলা গেল না সেগুলিকে এই অন্যান্য বিষয়ক ধাঁধার অন্তর্গত করা হল—

ধিমাল :

ইকা তাপ্রে টানিনু পাথোকা

সানাইতি পানু জিংখে বিগ্রিকা। —হাই? —চুর।

বাংলা :

মাথায় লালটুপি টানলে ছোট হয়

তার সঙ্গে বন্ধুত্বে অনেক ক্ষতি হয়। —কি? —বিড়ি।

ধিমাল :

এনং খোকইতা জাতেং ইহি নারিয়া। —হাই? —নারাকো ঢিপ।

বাংলা :

একটি পায়ে দাঁড়িয়ে আছে কি হাতি? —কি? —খড়ের গাদা।

ধিমাল :

এনং খামাতা দাকা সা।

চুমংসা পিয়া ধোইলী হা। —হাই? —ছাতি।

বাংলা :

একটি খুঁটি ঘরটি কালো।

ঘর ধরে গরু বাঁধতে গেল। —কি? —ছাতা।

ধিমাল :

ঝেমপাং আমখা

চি লিসিরাসং অলিখে

রিহিমা লোহোপাতেং থুইখে। —হাই? —সো।

বাংলা :

সারারাত জল খায়।

পিছন দিয়ে বেরিয়ে যায়,

সকাল বেলায় ঠকঠকায়। —কি? —ধরকা (বাঁশের তৈরি মাছ ধরার ফাঁদ)

ধিমাল :

এনং মালিকনীকো ইস্তুং প্রজা

ধন ইহি ঝুলিকা খুলি মাস্তু সোজা। —হাই? —বায়হাঁকে।

বাংলা :

এক মালকীনির অনেক প্রজা।

ঝুলে থাকে সম্পত্তি চুরি করা নয়কো সোজা। —কি? —মৌচাক।

ধিমাল :

অখন পুষতা ইস্তুং বে,

উম হোইনু এক লাংকে। —হাই? —জুহা।

বাংলা :

অঘ্রাণ ও পৌষমাসে অনেক বউ রাখে

ধান পুরালে একলাই ঘরে থাকে। —কি? —ইঁদুর।

উপরে উল্লেখিত ধাঁধা থেকে বলা যায় ধিমালদের মধ্যেও ধাঁধার প্রচলন আছে এবং যেগুলির বিষয় বৈচিত্র্যও কম নয়। আবার প্রচলিত বেশির ভাগ ধাঁধার উৎপত্তি হয়েছে পশুপাখি ও কীটপতঙ্গকে কেন্দ্র করে। পাশাপাশি অন্যান্য বিষয়কে আশ্রয় করেও একাধিক ধাঁধা পাওয়া যায়।

ধিমালদের বেশির ভাগ ধাঁধা রচিত হয়েছে ছড়ার ছন্দে। যেগুলির প্রধানত দুটি চরণে বিন্যস্ত। এবং প্রথম চরণের সঙ্গে দ্বিতীয় চরণের চরণান্তিক মিল রয়েছে।

পশুপাখি ও কীটপতঙ্গ সম্পর্কেও গভীর অভিজ্ঞতা বিশেষ করে পশুপাখি ও কীট পতঙ্গের বাহ্যিক আকার তাদের নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য ও তাদের ক্রিয়াকলাপগুলিই এই ধাঁধাগুলির মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

লোককথা :

লোকসাহিত্যের একটি বিশিষ্ট শাখা হল লোককথা। লোককথা ঐতিহ্য পরম্পরাগত ভাবে মুখে মুখে সৃষ্টি হয়ে মুখে মুখে প্রচার লাভ করে। এগুলি গদ্যে পরিবেশিত হয়। লোককথার নানা শ্রেণি রয়েছে; যেমন— পরীকথা, পশুকথা, ব্রতকথা, পুরাণকথা প্রভৃতি। আবার বিশ্বের বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত লোককথাগুলি বিচার বিশ্লেষণ করে দেখা যায় লোককথাগুলির মেজাজ ও চরিত্রগত সাদৃশ্য রয়েছে। আর এর উপর ভিত্তি করে ফিনল্যান্ডের লোককথা গবেষক এন্টি আর্নে লোককথার এক একটি টাইপ নির্ণয় করেন। আবার টাইপের উপর ভিত্তি করে অ্যামেরিকার লোকসংস্কৃতিবিদ স্টিথ থমসন মোটিফ নির্ণয় করেছেন। আমরা ধিমাল জনজাতির মধ্যে প্রচলিত লোককথাগুলি বিশ্লেষণ করে টাইপ ও মোটিফ ইন্‌ডেক্স চিহ্নিতকরণের চেষ্টা করেছি।

ডিমফোক ওঝাকো কাথা

(অহংকারী ওঝার কাহিনি)

অনেকদিন আগের কথা, এক গ্রামে এক অহংকারী ওঝা ছিল। ওঝার কাজ করতে করতে তার নাম চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ল। একদিন ওঝার ছেলের বিয়ে ঠিক হলে সে বাজনাদারদের ডেকে বলল, 'ও বাজনাদাররা বিয়ে করতে যাওয়ার সময় তোমাদের ঢাক আর সানাই-এ 'ডিম ওঝার বেটার বিয়ে' বলে বাজাতে হবে। তোমরা পারবে কি না?' বাজনাদাররা উত্তরে জানাল, 'কেন পারব না? যেমন বলবে, আমরা তেমন-ই বাজাব। তোমাকে চিন্তা করতে হবে না।' তারপর তারা 'ডিম ওঝার বেটার বিয়ে' বলে সানাই বাজাতে শুরু করল। বাজনাদাররা একটু পরে ওঝা বাবার কাছে জানতে চাইল হচ্ছে কি না? ওঝা খুশি হয়ে বলল, 'ঠিক আছে, ঠিক আছে।' তখন সবাই সেজেগুজে ডিম ওঝার বেটার বিয়ে বাজাতে বাজাতে বিয়ে করতে চলল। বিয়ে করতে যাওয়ার সময় রাস্তার পাশে এক বৃদ্ধ লেংটি পরে পাটের জমিতে নিড়ানি দিচ্ছিল। সে পাট নিড়ানো বন্ধ করে রাস্তায় দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কার ছেলের বিয়ে?' বরযাত্রীরা জানাল, 'ঢাক আর সানাই-এর বাজনা শুনছ না কি?' তখন বৃদ্ধ বলল, 'আমি বৃদ্ধ মানুষ ভালো করে কানে শুনি না।' তখন সবাই বলল, ' ডিম ওঝার বেটার বিয়ে।' ডিম ওঝার বেটার বিয়ের কথা শুনে বৃদ্ধ 'একটু বরকে দেখাও না' বলে অনুরোধ করতে লাগল। দু'চারজন বরযাত্রী বলল, 'বৃদ্ধ মানুষ

বরকে দেখতে চায়, দেখাও একটু দেখাও।' তখন পালকির দরজা খুলে বরকে দেখানো হল। তখন বৃদ্ধ দেখে বলল, 'এটা ডিম ওঝার বেটা। এটা তো একটা পাঁঠা।' সবাই দেখল পালকিতে বর নেই, একটি পাঁঠা আছে। সবাই অবাক হয়ে ডিম ওঝার কাছে খবর পাঠালো। ডিম ওঝা খবর পেয়ে অবাক হয়ে ছুটে এল। জল পড়া, তেল পড়া তুকতাক মন্ত্রতন্ত্র করে ওঝা ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ল। তখন বরযাত্রীদের জিজ্ঞেস করল, 'এটা কি করে হল? বাড়ি থেকে তো ভালোই বের হয়েছিল, রাস্তায় তোমরা কি করলে?' তখন বরযাত্রীরা জানাল, 'এই পাট ক্ষেতে একজন লেংটি পরা বৃদ্ধ ছিল, সে রাস্তায় এসে জিজ্ঞেস করেছিল কার বিয়ে? আমরা বলেছিলাম ঢাক আর সানাই-এ কি বাজছে শুনছ না কি? সে বলল সে নাকি ভালোভাবে শোনো না। তখন আমরা তাকে 'ডিম ওঝার বেটার বিয়ে' বলে শোনালাম। ওটা শুনে সে বরকে দেখার জন্য অনুরোধ করল। আমরা বৃদ্ধলোক অনুরোধ করছে বলে পালকির দরজা খুলে বরকে দেখালাম। তখন বৃদ্ধ বলল, 'এটাই ডিম ওঝার বেটা! এতো পাঁঠা।' সবাই দেখছি আমাদের বর নেই, আছে একটি পাঁঠা।' এসব কথা শুনে ডিম ওঝা বলল, 'ঐ বৃদ্ধের কাজ।' আমি তো তোমাদের বলেছিলাম, 'সোজাসুজি তোমরা যাবে, রাস্তায় পালকি থামিয়ে বরকে কেন দেখালে? তোমরা ভুল করেছ। চল এখন ঐ বৃদ্ধকে খুঁজতে।' বৃদ্ধ তার কাজ সেরে বাড়ি চলে গেছে। বাড়িতে গিয়ে স্নান করে ভাত খেয়ে নারকেলের হুঁকো গুড়গুড় করে টানছে। আর নাক দিয়ে ধোঁয়া বের করছে। ঠিক সেই সময় ডিম ওঝা তার বন্ধুবান্ধব সঙ্গে নিয়ে বৃদ্ধের বাড়িতে এল। ডিম ওঝা পান সুপারি তার পায়ে দিয়ে জোড় হাতে বলল, 'তুমি আমার ধরম বাবা। আমার ছেলেকে ঠিক করে দাও।' বৃদ্ধ অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল তুমি কে? ডিম ওঝা জানায়, সে ডিম ওঝা। শুনে বৃদ্ধ বলল, 'তুমি ডিম ওঝা দুনিয়ার বড় ওঝা। আমি তো ওঝা নই কেন আমার কাছে এসেছ আমি কিছুই করিনি। ডিম ওঝা কান্নাকাটি শুরু করে বলল, 'বাবা এ তোমারই কাজ, তুমিই পারবে ঠিক করতে। আমার কিছু ভুল হলে তুমি আমাকে মাপ করে দাও।' ডিম ওঝার কান্নাকাটিতে বৃদ্ধের বউ বলল, 'তুমি কি বাহানা করছ? তুমি এ কাজ করলে ঠিক করে দাও।' বৃদ্ধ বলল, 'ও ডিম ওঝা ফিরানী করে ঠিক করতে পারছে না। আমি না জানা মানুষ কি করব।' ডিম ওঝা বলল, 'আর আমার মন্ত্র নাই, আমি আর পারব না।' তখন বৃদ্ধ হাসতে হাসতে তাহলে চল বলে, সবার সঙ্গে পালকির কাছে গেল। বৃদ্ধ বলল, 'আমার কাছে তো মন্ত্র-তন্ত্র নাই বাজনাদারদের বাজনা পরিবর্তন করে বাজাতে হবে। বুড়া ঠাকুর কি বাজাতে হবে? ডিম ওঝার বেটার বিয়ে নয় এবার বাজাতে হবে, 'ডিমসে ডিম বড় তার

থেকে পৃথিবী বড়।' তখন হাঁড়ি বাজনাদাররা বাজাতে শুরু করল। বৃদ্ধ শুনে বলল, হ্যাঁ ঠিক আছে। এখন বাজাতে বাজাতে পালকির চারিদিকে পাঁচ পাক ঘুর। ডিম সে ডিম বড়, তার থেকে পৃথিবী বড় বাজাতে বাজাতে পাঁচবার ঘোরার পর হাঁড়ি বাজনাদাররা বলল, 'এবার হচ্ছে কি না?' বৃদ্ধ উত্তর দেয়, হচ্ছে। বরযাত্রীদের পালকির দরজা খুলে দেখার জন্য নির্দেশ দিল। তখন পালকি খুলে দেখে যেমন বর তেমনি পালকিতে বসে আছে। বৃদ্ধ বলল, 'ডিম ওঝার বেটার বিয়ে বাজালে আবার বড় পাঁঠা হয়ে যাবে, আর আমি ঠিক করতে পারব না।' ডিম ওঝা শুনে বলল, 'আমার ভুল হয়ে গেছে আর ভুল হবে না বাবা। এই পান সুপারি দিচ্ছি, তোমার নাতির বিয়ে খেতে মায়ের সঙ্গে আসতে হবে।' তখন বৃদ্ধ হেসে বলল, 'বিয়ে করতে যাও ভালোভাবে, অহংকার করবে না।'

এই লোককথাটিকে যদি টাইপ-মোটিফ ইনডেক্স অনুযায়ী বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে এর টাইপ-মোটিফ হবে নিম্নরূপ—

ক. টাইপ : ৮৪০ মানুষের পাপের শাস্তি

খ. মোটিফ : সি ৩৪৫ বিবাহ

ডি ১৩৪ রূপ পরিবর্তন : মানুষ থেকে ছাগল

ডি ৬১০ বারবার রূপ পরিবর্তন

এল ৪৭৭ অহংকারীর পতন

'অহংকারী ওঝার কাহিনি' একটি নীতিকথামূলক লোককথা। এই লোককথায় আমরা এক অহংকারী ওঝাকে পাই। আসলে সমাজ বিবর্তনের পথে সমাজ থেকে কিছু মানুষ তাদের বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগিয়ে নিজেদের শ্রেষ্ঠ ও স্বতন্ত্র বলে ভাবতে থাকে। ফলে তারা অসম্ভবকেও সম্ভব করতে প্রয়াসী হয়। এমনকি সমাজের অন্যান্য মানুষের প্রতিও তাদের ঔদ্ধত্যের প্রকাশ ঘটাতে থাকে। কিন্তু সমাজের শোষিত শ্রেণির যখন শোষিত হতে হতে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যায়, তখন তারা প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। তাদের সম্মিলিত শক্তির কাছে তখন অহংকারীকে মাথা নোয়াতে হয়। অহংকারী ওঝার পতনের মধ্যে দিয়ে ধিমালরা বোঝাতে চেয়েছে যে অহংকারের ফল কখনো ভালো হয় না।

পুইহা রাজাকো চান কাথা

(সাপ রাজপুত্রের কথা)

এক বৃদ্ধের সাতজন মেয়ে ছিল। একদিন বৃদ্ধ মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করতে বনে গেল। সারাদিন ঘুরে ঘুরে বিকেলে ক্লান্ত হয়ে সবাই এক ডুমুর গাছের তলায় এসে হাজির হল। উপরে পাকা ডুমুর খাওয়ার জন্য বৃদ্ধ গাছে উঠলে সঙ্গে সঙ্গে গাছে থাকা একটি বড় সাপ বৃদ্ধকে জড়িয়ে ধরল এবং বলল, 'তুমি যদি বাঁচতে চাও তো তোমার এক মেয়ে আমাকে দাও'। বৃদ্ধ ভয় পেয়ে মেয়েদের বলল, 'আমার জীবনের আর আশা নেই। এই সাপ কি বলছে? এর সঙ্গে আমার এক মেয়ে থাকলে ও আমাকে ছেড়ে দেবে। কে থাকবে?' বড় মেয়েকে থাকার জন্য অনুরোধ করলে বড় মেয়ে জানায়, 'বাবা আমি এই সাপের সঙ্গে জঙ্গলে থাকতে পারব না।' তারপর তার ছোট মেয়েকে ডেকে বলল, 'মেয়ে তোমার কি মত?' ঐ মেয়েও জানায়, 'বাবা আমি সাপকে বড় ভয় পাই, তুমি সাপের সঙ্গে আমাকে থাকতে বলো না।' আবার বৃদ্ধ অন্য মেয়েদের জানায়, 'মেয়েরা আজ আমার জীবনের আশা নেই, তোমরা এই সাপের সঙ্গে থাকলে সে আমাকে ছেড়ে দেবে। কি করবে তোমরা?' তারাও জানায়, 'বাবা এই সাপের সঙ্গে আমরা থাকলে মারা পড়বো। তুমি আমাদের এই সাপের সঙ্গে থাকতে বলো না।' এভাবে তার ছয়জন মেয়ের কেউই রাজি হল না। অবশেষে রইল তার সব থেকে ছোট পা খোঁড়া মেয়েটি। বৃদ্ধ কেঁদে কেঁদে বলল, 'তোমরা বাড়ি যাও আর তোমার মাকে আমার বিপদের কথা বলো।' তখন তার ছোট মেয়েটি এগিয়ে এসে বলল, 'বাবা কাঁদছ কেন? আমি থাকলে হবে না। একদিন না একদিন আমাকে কাউকে না কাউকে দিতেই হবে। খোঁড়া মেয়েটি হাত জোড় করে বলল, 'হে সাপ তুমি আমার বাবাকে ছেড়ে দাও। আমি বাবার সব থেকে ছোট মেয়ে। আমি থাকলে হবে না?' তখন সাপ তার বাবাকে ছেড়ে দিল। সাপ বলল, রাজি আছ তো চল এখন আমার সঙ্গে। সাপ দেখতে দেখতে খোঁড়া মেয়েকে নিয়ে চলে গেল। বৃদ্ধ কান্নাকাটি করে ছয় মেয়েকে নিয়ে বাড়ি ফিরে এল।

সাপ ছিল রাজার ছেলে। খোঁড়া মেয়ে সাপের সঙ্গে আছে। সাপ তাই মেয়েটিকে বিয়ে করল। একদিন মাঝরাতে খোঁড়া মেয়েটি দেখল সাপ সাপ নয়। রাজকুমার সে। আস্তে আস্তে সাপের চামড়ার খোলস থেকে বের হয়ে চামড়া লুকিয়ে রাখল। সুন্দর রাজকুমার হয়ে এক দু'ঘণ্টা গ্রামের এখানে সেখানে ঘুরে ফিরে আসল। তারপর সাপের চামড়া পরে আবার সাপ হয়ে গেল।

খোঁড়া মেয়েটি চুপি চুপি দেখে আর মনে মনে ভাবে এতো সত্যিকারের সাপ নয়। এতো রাজার ছেলে রাজপুত্র। তখন সে মনে মনে বলে এর সাপের চামড়া জ্বালিয়ে দিতে হবে। না থাকবে চামড়া, না হবে সাপ। ওর সাপ হয়ে আমাকে ঠকানোর খেলা শেষ হয়ে যাবে। পরের দিন মাঝরাতে আবার রাজকুমার সাপের চামড়া থেকে বের হয় চামড়াকে একটি জায়গায় রেখে রাজ্যের প্রজাদের দেখতে চলে গেল। খোঁড়া মেয়েটি চুপি চুপি চামড়া বের করে জ্বালিয়ে দিল। রাজকুমার ঘুরে ফিরে এসে সাপের চামড়া খুঁজে না পেয়ে অবশেষে বউকে বলল, 'ওগো এখানে আমার সাপের চামড়া ছিল; তুমি কি করলে?' তখন তার খোঁড়া বউ জানায়, 'তুমি বেশ ভালো মানুষ তো, মানুষ হয়েও সাপ হয়ে নিজের বউকে ঠকাচ্ছ। এটা তোমার কি নীতি? তুমি সত্যিকারের মানুষ এটা সবাই দেখুক। তুমি সাপ নও। এই সত্যিটা সবাইকে দেখানোর জন্যই আমি তোমার সাপের চামড়া আগুনে জ্বালিয়ে দিয়েছি। তোমাকে আর সাপের জীবন ধারণ করতে হবে না।' রাজকুমার শুনে বলল, 'এটা ঠিক করোনি।' তার বউ বলল, 'এটাই ঠিক। আমি মানুষ। আমার মানুষ চাই, তার জন্য এটা করা। আমার স্বামী মানুষ হয়ে থাকুক।' তারপর রাজকুমার মানুষ হয়ে থাকলো। রাজার বৈদ্যরা মেয়েটির খোঁড়া পা ঔষধ দিয়ে ঠিক করে দিল। রাজকুমারের বউ-এর জ্ঞান, গরিমা ও ব্যবহারে সবাই খুশি। একদিন রাজকুমারের বউ রাজকুমারকে বলল, 'রাজকুমার অনেকদিন হল, চল না বাবা-মাকে দেখে আসি।' রাজকুমার বলল, 'ঠিক আছে। কি অবস্থায় আছে আমার শ্বশুর-শাশুড়ি?' তখন রাজকুমার বউকে সঙ্গে নিয়ে অনেক মিষ্টি-মিষ্টান্ন দাস-দাসী সঙ্গে করে শ্বশুর বাড়ি এসে উপস্থিত হল। গ্রামের মানুষ তার বাবা মা প্রথমে কেউ তাকে চিনতে পারল না। রাজবাড়িতে থেকে মেয়েও অনেক সুন্দরী হয়েছে। বাবা মায়ের অবস্থা খুবই খারাপ হয়েছে। ঘরে খাবারেরও অভাব। মেয়ে চাল, তেল, মাংস, সবজি, ঘি, চিড়া, মিষ্টান্ন বাবা-মায়ের জন্য ও গ্রামের অন্যান্য মানুষের জন্য নিয়ে এসেছে। সবাইকে বলল, 'আমি তোমাদের খোঁড়া মেয়ে বাবা। আমাকে জঙ্গলে সাপকে দিয়ে চলে এসেছিলে। এ হচ্ছে তোমাদের সাপ জামাই। সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। মা কান্নাকাটি করে মেয়েকে জড়িয়ে ধরল। রাজকুমারের বউ তার কিসের অভাব। চারদিন পর বাবা মা গ্রামের মানুষদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রাজকুমারের সঙ্গে বাড়ি চলে গেল।

বোন চলে গেলে বড় দিদি বৃদ্ধ বাবাকে বলল, 'বাবা আমারও সাপ বর চাই। তুমি জঙ্গল থেকে আমার সাপ বর খুঁজে নিয়ে এসো।' তার বাবা বলল, 'কি কথা বলছ? না পারব না।' বড় মেয়েও নাছোড়বান্দা সে বলল, 'আমি সাপ বরকেই বিয়ে করবো। তা না হলে আমি কিছুই খাব

না।' মেয়ের প্রতি স্নেহে তাই সে বড় বস্তা নিয়ে জঙ্গলে গেল সাপ খুঁজতে। খুঁজতে খুঁজতে সে একটি বড় অজগর সাপ পেয়ে গেল। অনেক কষ্ট করে বস্তায় বন্ধ করে বাড়িতে নিয়ে এল। একটি ঘরে বড় মেয়ের সঙ্গে সাপকে রেখে দিল। সাপ বস্তা থেকে বেরিয়ে মেয়েটির পা ধরলো ও আস্তে আস্তে গিলতে শুরু করলো। ঘরের ভেতর থেকে মেয়ে বলল, 'বাবা আমার পা ব্যথা করছে।' ব্যথা হোক, ব্যথা হোক, মেয়ে পায়েল পরাচ্ছে। আবার আমার কোমড় ব্যথা করছে— শুনে বাবা বলছে; 'ব্যথা করুক, ব্যথা করুক মেয়ে, কোমরের অলংকার পরাচ্ছে।' 'বাবা আমার হাত ব্যথা করছে।' 'করুক করুক মেয়ে চুরি ও বাঁশপাতারি পরাচ্ছে।' সাপ তাকে গোগ্রাসে খাচ্ছে। আবার মেয়েটি বলল, 'বাবা আমার গলা ব্যথা করছে' 'করুক মেয়ে চন্দ্রহার পরাচ্ছে।' এই বলে মেয়ের কথা বলা বন্ধ হলে তার বাবা ধারালো কুকরী নিয়ে অজগর সাপটির পেট কেটে মেয়েটিকে বের করলো। মেয়েটি বেঁহুশ হয়ে পড়ে রইল। অনেকদিন পর মেয়ে ঠিক হল। তখন তার বাবা তাকে জিজ্ঞেস করে, 'আরো সাপ বর চাই কি না?' সে কোন উত্তর দেয় না। মা-বাবার কথা না শুনলে ও লোভ করলে এমনই হয়। সাপের পেট কেটে বের না করলে কি হতো বলতো?

এই লোককথাটিকে যদি টাইপ-মোটিফ ইনডেক্স অনুযায়ী বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে এর টাইপ-মোটিফ হবে নিম্নরূপ—

ক. টাইপ : ৪৩৩ সাপের রূপে রাজপুত্র

খ. মোটিফ : ডি ১৯১ রূপ পরিবর্তন : মানুষ থেকে সাপ

ডি ৭২১.৪ ছদ্মবেশ থেকে মুক্ত করতে চামড়া বা খোলস নষ্ট করে ফেলা

'সাপ রাজপুত্রের কথা' এটি নীতিকথামূলক লোককথা। সত্যিকারের ভালোবাসা বলতে কী বোঝায় তা এই লোককথার মধ্যে দিয়ে বোঝানো হয়েছে। মানুষ বিপদে পড়লেই সত্যিকারের মানুষ কে তা উৎঘাটন করতে পারে। কারণ বিপদের সময় কোন ফাঁকি চলে না। তাছাড়া আকাশ ছোঁয়া স্বপ্ন, বা অসম্ভব চাওয়া যে মানুষকে হিতাহিত বোধ থেকে দূরে ঠেলে দেয় এবং তার জেরে ভয়ঙ্কর বিপদ ঘনিয়ে আসে এই সত্যটিও প্রকাশ পেয়েছে ধিমালদের এই লোককথাটিতে। তাছাড়া জীবজন্তুর সঙ্গে মানুষের বিবাহ দেওয়ার মধ্যে দিয়ে ধিমালদের টোটেম ভাবনার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

‘কারহুয়ানী বেরাঙকো কাথা’

(ঘটকী বুড়ির কথা)

অনেক দিনের কথা গ্রামে এক ঘটকী বুড়ি ছিল। গ্রামের অনেক যুবক-যুবতীর ঘটকালী করত সে। তাই সবাই তাকে চেনে ও খাতির করে। ঘটকালী করার খবর দূরের গ্রামের মানুষও জানে। এই কথা জঙ্গলের পশুরাও শুনেছে। একদিন রাত্রে ঘটক বুড়ির উঠানে একটি বাঘ এসে বলল, ‘বুড়ি মা, ও বুড়ি মা, বাড়িতে আছ নাকি?’ ঘটকী বুড়ি ঘর থেকেই বলল, ‘আজ রাতে আবার কে এল?’ বেড়ার ফাঁক দিয়ে দেখে তার চোখ কপালে উঠলো, সে ভয়ে থরথর করে কাঁপতে শুরু করলো। মুখ থেকে কোন কথাও বের হচ্ছিল না তার। মনে মনে বলল, ‘আমার জীবনের আর আশা নেই। কে আমাকে বাঁচাবে? বাঘ একটু পরে আবার বলল, ‘ঘটকী বুড়ি মা, কেন কথা বলছ না? ভয় পেলে নাকি? আমি তোমার কোন ক্ষতি করব না। ঘর থেকে বের হও আমার কথা শোন। তখন এক পা দু’পা করে ঘর থেকে বের হয়ে এলো। ‘কেন আসলে বাবু’? — বলল ঘটকী বুড়ি। শুনেছি, ‘তুমি ঘটকালী করে সবার কনে ও বরের জোড়া মিলিয়ে দাও। আমার বাঘিনি মারা গেছে, আমাকেও একটি বাঘিনী খুঁজে দাও।’ ঘটকী বুড়ি মনে মনে বলে, ‘এটা কেমন কথারে বাবা— আমি তো মানুষের ঘটকালী করি বাঘের করলে তো মারা পরবো। এখন করতে পারব না বললে রেগে বাঘ আমাকে মেরে ফেলবে। তারজন্য বুদ্ধি বের করে ঘটকী বুড়ি বলল, ‘ঠিক আছে বাবু তুমি একমাস পরে এসো তোমার কনে খুঁজতে সময় লাগবে তো।’ এই কথা শুনে বাঘ বলল, ‘আমার কাজ হওয়া চাই বুড়ি মা। শুনে ঘটকী বুড়ি বলল— তুমি বাবু চিন্তা কোর না তোমার কাজ হয়ে যাবে। তখন বাঘ খুশি হয়ে জঙ্গলে চলে গেল। ঘটকী বুড়ি সেই রাত ভয়ে আর ঘুমোতে পারল না। চিন্তায় চিন্তায় রাত শেষ হয়ে গেল। কি করব কি না করব— ভেবে দুশ্চিন্তায় তার দিন কাটতে লাগল। একদিন তার মাথায় এক বুদ্ধি এল। তাই খুশি হয়ে মোটা চট তৈরির জন্য হাট থেকে পাট কিনে নিজেই বাড়িতে চট তৈরি করতে শুরু করলো। এক মাসে চট তৈরি শেষ হয়ে গেল। একদিন সন্ধ্যায় ‘ঘটকী বুড়ি মা’ ডেকে বাঘ তার বাড়িতে এল। বুড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে বলল, ‘বস বাবু বস।’ বাঘ বলল, ‘আমার কাজ হয়েছে কি না?’ ঘটকী বুড়ি বলল, ‘হবে না মানে! তুমি তোমার কাজ আমার হাতে দিয়েছ। এই হাত সবার কাজ করে দেয়, আমার হাতে যাদুমন্ত্র আছে। তোমাকে একটি কাজ করতে হবে।’ বাঘ বলল, ‘একটি কাজ কেন? কনের জন্য কত কাজ করতে হবে বলো, আমি করে দেখাবো।’

ঘটকী বুড়ি বলল, 'তুমি ঠিক সময়ে এসেছ, নদীতে বন্যাও এসেছে কনে দুটি বাচ্চা নিয়ে তোমার অপেক্ষায় আছে।' কথা শুনে বাঘ ঘটকী বুড়িকে বলল, 'কোথায় আছে আমার বাঘিনি?' নদীর ধারে উঁচু পারে দাঁড়িয়ে বুড়ি বলল, 'তোমার বাঘিনি দূরের জঙ্গলে আছে। এসো চটের ভেতরে ঢুকো আর কনেকে নিয়ে এসো। তখন খুশি হয়ে বাঘ চটের ভেতরে ঢুকে যায়। তখন বুড়ি বস্তার মুখ শক্ত করে বেঁধে— 'এখন বাবু ভালোভাবে যাও' বলে নদীর উঁচু থেকে বন্যার জলে ভাসিয়ে দিল। এতদিন পর ঘটক বুড়ির দুশ্চিন্তা দূর হল। সে মহানন্দে বলে উঠল— 'এতদিনে মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচলাম'। বাঘ বন্যার জলে সারারাত হেলেদুলে ভাসতে ভাসতে দূরের জঙ্গলের পাশে পৌঁছল। সত্যি সেখানে এক বাঘিনি তার দুটি বাচ্চা নিয়ে খাবারের জন্য নদীর দিকে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ দেখে একটি বস্তা ভেসে আসছে। বাঘিনি নদীতে গিয়ে বস্তাটাকে টেনে তুলল ডাঙায়। ছিড়ে ছুঁড়ে দেখলো তার ভেতরে একটি বাঘ। 'বাঘিনি আমি তোমার জন্যই কষ্ট করে এসেছি।' বাঘিনি মনে মনে ভাবতে লাগল, ভালোই হল আমার বাঘও মারা গেছে। তার জন্য সেও বলল, 'আমিও তোমার জন্য এই দুইটি বাচ্চা নিয়ে অপেক্ষা করছি।' দুজনে খুশি হয়ে জড়িয়ে চুমু খেতে লাগল।

এরপর বাঘ বলল, 'এই জঙ্গলে থাকার দরকার নেই। চল আমার জঙ্গলে।' দুটি বাচ্চা ও তারা অনেকদিন পরে ফিরে এল তার জঙ্গলে। বাঘ বলল, 'চল আমার ঘটকী বুড়ি মায়ের সঙ্গে দেখা করে আসি। সেই আমার সঙ্গে তোমার মিল ঘটিয়েছে।' তারপর একদিন রাতে বাচ্চা ও বাঘিনিকে নিয়ে তার বাড়িতে ঘুরতে গেল। অনেক দিন হয়ে গেল ঘটকী বুড়ি বাঘের কথা ভুলেই গেছে। খেয়ে দেয়ে ঘুমোচ্ছে। ঠিক সেই সময় বাঘ তার আঙিনা থেকে ডেকে বলতে লাগল, 'ঘটকী বুড়িমা ঘুমোলে নাকি? ওঠো আমি তোমার বাড়িতে বেড়াতে এসেছি।' ঘটকী বুড়ি শুনে বলতে লাগল, 'এত রাত্রে কে আবার এল? অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে বাঘরা বসে আছে। আজ আমাকে এই বাঘগুলি খেয়ে ফেলবে। একটি থেকে কোনক্রমে বাঁচলাম, এবার এলো অনেকগুলি বাঘ। এখন কি করি? বাঘ বলল, 'ঘটকী বুড়িমা তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।' ঘটকী বুড়ি মনে মনে বলতে লাগল, 'এবার মরণ নিশ্চিত' তবুও প্রাণ হাতে করে নিয়ে মাটির প্রদীপ জ্বালিয়ে বাইরে এল। দেখে বন্যার জলে ভাসিয়ে দেওয়া বাঘটি, ভয়ে বুড়ি কিছুই আর বলতে পারল না। বাঘ বলল, 'ঘটক বুড়িমা আমি তোমার কথা ধরে আমি আমার বাঘিনি কনেকে পেয়েছি। দেখো তোমার দুইজন নাতি নাতনিও এসেছে। এই সোনা রুপো তোমার জন্য এনেছি ধর।' ঘটকী বুড়ি

বলল, 'এই সোনা রুপো আমার প্রয়োজন নেই। এগুলি আমার কাছে থাকলে চোর ডাকাত আমাকে মেরে ফেলবে।' ঘটকী বুড়ির কথা শুনে বাঘ জোরের সঙ্গে জানাল, 'চোর ডাকাত তোমার বাড়িতে আর আসবে না। আমি কি জন্য আছি? রাত্রে আমি পাহারা দেব। তুমি এখন নাকে তেল দিয়ে ঘুমোও।' তারপর থেকে ঘটক বুড়ি ভালো ঘর বাড়ি বানিয়ে খুশিতে দিন কাটাতে লাগল।

পশুদের উপকার করলে তারা মনে রাখে। উপকার করে।

এই লোককথাটিকে যদি টাইপ-মোটিফ ইনডেক্স অনুযায়ী বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে এর টাইপ-মোটিফ হবে নিম্নরূপ—

ক. টাইপ : ১৬০ কৃতজ্ঞ পশু অকৃতজ্ঞ মানুষ

খ. মোটিফ : বি ২৪০.৫ বাঘ

বি ৩০০ সাহায্যকারী পশু

বি ৪৩১.৩ উপকারী বাঘ

বি ৫৭১ মানুষের জন্য পশু কাজ করে

টি ৫৩.৭ ঘটক হিসেবে বুড়ি ঠাকুমা

কে ৭১১ ছলনা করে ব্যাগে বন্দি

'ঘটকী বুড়ির কথা' এটি একটি নীতিকথামূলক গল্প। এই গল্পে মানুষের নির্মমতা ও অকৃতজ্ঞতার দিকটিকে তুলে ধরা হয়েছে। মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ জীব। সভ্যতার বিবর্তনের পথে মানুষ সুসভ্যতায় উন্নীত হলেও কিছু মানুষ তাদের আদিম হিংস্রতাকে ত্যাগ করতে পারেনি। সে তুলনায় বনের পশুরাও মানুষ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাদের কৃতজ্ঞতার গুণে। তারা উপকারীর উপকারকে কখনো ভোলে না। উপকারীর প্রতি তারা আজীবন কৃতজ্ঞ থাকে। এই লোককথায় পশুর মধ্যে দিয়ে মানুষকেই শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

‘ভোতো শিয়াইলেকো দাহিমুন চাকা কাথা’

(খরগোশ ও শিয়ালের দই চিড়া খাওয়ার গল্প)

এক জঙ্গলে এক শিয়ালের সঙ্গে এক খরগোশের খুব বন্ধুত্ব ছিল। জঙ্গলে এক জায়গায় থাকত। তারা একসঙ্গে ঘোরাফেরা করত। একদিন শিয়ালের দই চিঁড়া খাওয়ার খুব ইচ্ছে হল। কেমন করে খাব চিন্তা করতে করতে একদিন তার বন্ধু খরগোশকে বলল, ‘ও বন্ধু তোমাকে একটি কথা বলতে চাই’ খরগোশ বলল, ‘কি কথা? বল’। শিয়াল বলল, ‘কথা কিছুই নয় আমার মনে অনেকদিন থেকেই দই-চিঁড়া খাওয়ার ইচ্ছে জাগছে কেমন করে খাব? তাই তোমাকে বলছি।’ শুনে খরগোশ বলল, ‘এই কথা তুমি মনের মধ্যে রেখেছ। আসছে হাট বারে আমি তোমাকে দই-চিঁড়া খাওয়াবো।’ শিয়াল বলল, ‘ঠিক কথা বলছ তো বন্ধু!’ খরগোশ বলল, ‘হ্যাঁ হ্যাঁ সত্যিই বলছি, তুমিও খাবে আমিও খাব। আমার কাছে বুদ্ধি আছে। কি বুদ্ধি আছে আমাকে বল না!’ খরগোশ বলল, ‘জঙ্গলের ধারে হাটে যাওয়ার রাস্তায় যেতে হবে। দই চিঁড়া বিক্রি করা লোক একা একা হাটে যাওয়া দেখলে, তার আগে আমি পা ভাঙার মতো খোঁড়াতে খোঁড়াতে হাটবো পা ভাঙা খরগোশ ভেবে আমাকে ধরতে আসবে তাড়া করে, তখন আমি তাকে অনেক দূরে নিয়ে যাব তুমি ঐ ফাকে তাদের দই চিঁড়া জঙ্গলে লুকিয়ে রাখবে। তারপর আমরা দুজনে ভাগ করে খাব, বুঝলে তো। এ কথা শুনে শিয়াল বলল, ‘তোমার ভালো বুদ্ধি আছে সত্যি।’

তারপর তারা হাট বারে রাস্তায় অপেক্ষা করতে লাগল। একজন দই বিক্রেতা বাঁকে দই নিয়ে আসছে দেখে খরগোশ শিয়ালকে বলল, ‘তুমি জঙ্গলে লুকিয়ে থাকো বন্ধু। আমি তাকে খোঁড়াতে খোঁড়াতে অনেক দূরে নিয়ে যাবো ভুলিয়ে ভালিয়ে। তুমি তার দই এর ভার জঙ্গলে লুকিয়ে রাখবে।’ শিয়াল জঙ্গলে লুকিয়ে রইল আর খরগোশ রাস্তায় খোঁড়াতে খোঁড়াতে হাঁটতে শুরু করল। দই বিক্রেতা ভাবতে লাগল, পা ভাঙা খরগোশ ধরা যাবে তাহলে— তখন রাস্তার ধারে দই এর ভার ভালোভাবে রেখে খরগোশকে ধরার জন্য তাড়া করতে লাগল। খরগোশ পা ভাঙার ভান করে তাকে অনেক দূরে নিয়ে জঙ্গলে ঢুকে লুকিয়ে পড়ল। তখন লোকটি ক্লান্ত হয়ে দই-এর ভারের কাছে ফিরে এল এবং দেখল তার দই এর হাঁড়িগুলি নেই। তখন মন খারাপ করে বাড়ির দিকে পা বাড়াল।

তারপর চিঁড়া বিক্রেতার অপেক্ষায় খরগোশ শিয়াল রাস্তায় অপেক্ষা করতে লাগল।

অনেকক্ষণ পর একজন চিঁড়া বিক্রেতা চিঁড়ার বস্তা নিয়ে একই পথে আসছে দেখে শিয়াল জঙ্গলে লুকিয়ে পড়ল। খরগোশ তার সামনে পা ভাঙার মতো করে খোঁড়াতে খোঁড়াতে হাঁটতে শুরু করল। পা ভাঙা খরগোশকে ধরার জন্য চিঁড়া বিক্রেতা লোকটিও তাড়া করা শুরু করল। খরগোশ মিছেমিছি খোঁড়াচ্ছে আর দৌঁড়াচ্ছে। এভাবে করতে করতে তাকেও অনেক দূরে নিয়ে গেল। আবার সে দৌঁড়ে জঙ্গলের ভিতরে ঢুকে লুকিয়ে পড়ল। চিঁড়া বিক্রেতা ক্লান্ত হয়ে চিড়ার বস্তা রাখার স্থানে ফিরে এসে দেখে তার চিঁড়ার বস্তা নেই। অবাক হয়ে বলল, কে নিয়ে গেল? এখানেই তো রেখেছিলাম। মন খারাপ করে সেও বাড়ির পথে রওনা হল। খরগোশ ক্লান্ত হয়ে ফিরে এসে দেখল শিয়াল ভর পেট খেয়ে ঘুমোচ্ছে। খরগোশের জন্য কিছুই রাখেনি। রেগে খরগোশ বলল, 'শিয়াল বন্ধু আমার ভাগ কোথায় রেখেছো?' শিয়াল চোখ রাঙিয়ে, দাঁত বের করে বলল, 'তোমার জীবনের আশা থাকলে এখান থেকে পালাও তা-না হলে তোমাকেও ধরে খাবো।' খরগোশ রাগ করে বলল, 'তুমি বেইমান, বেইমানের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা ঠিক নয়।' সেদিন থেকে সে শিয়ালের সঙ্গ পরিত্যাগ করল।

এই লোককথাটিকে যদি টাইপ-মোটিফ ইনডেক্স অনুযায়ী বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে এর টাইপ-মোটিফ হবে নিম্নরূপ—

ক. টাইপ : শিয়ালের দ্বৈত চরিত্র

খ. মোটিফ : বি ২১০ কথা বলা পশু

বি ৩০০ সাহায্যকারী পশু

বি ৩৬৫.২ বন্ধুকে উপকার করায় কৃতজ্ঞ পশু

'খরগোশ ও শিয়ালের দই চিঁড়া খাওয়ার কথা' এটি একটি নীতিকথামূলক লোককথা। লোককথায় বর্ণিত পশুপাখিগুলিও মানুষের মতো আচরণ করে। এরা আসলে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির প্রতিনিধি। সভ্যতার আদিম পর্বে পশু ও মানুষকে অভিন্নরূপে কল্পনা করা হত। এই পশুপাখিগুলির মধ্যে দিয়ে তাই সমাজমনস্কতার পরিচয় পাওয়া যায়। এই লোককথায় বর্ণিত শিয়াল ও খরগোশ আসলে সমাজের দুই (শোষক ও শোষিত) শ্রেণির মানুষের প্রতিনিধি। সমাজের এক শ্রেণির মানুষ আছে যারা সমাজের নিচে থাকা দুর্বল শ্রেণির মানুষের সরলতা ও

বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে নিজের স্বার্থ কায়েম করে ও তাদের ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করে। এবং শেষে উপকারীর উপকার তো করেই না, বরং তার চাহিদাকে দমিয়ে রাখে। এমনকী তার ক্ষতি করতেও দ্বিধা করে না। আসলে সমাজের তলার মানুষেরা চিরদিনই শোষিত সেই বার্তা প্রকাশ পেয়েছে এই লোককথাটির মধ্যে দিয়ে।

'ঠক ইয়োলা গেলাইকো কাথা'

(ঠক ভাইদের কথা)

এক গ্রামে সাত ভাই ঠক ছিল। একদিন তারা গ্রামে থাকা বৃদ্ধ দাদুর বাড়ি এল। তখন দাদু বাড়ি থেকে একটু দূরে জমিতে চাষ করছিল। দাদুকে বাড়িতে না পেয়ে তারা জমিতেই গেল এবং বলল, 'দাদু তোমার একটা জিনিস চাইতে এসেছি আমাদের দিলে ভালো হয়, দিদাকে বললাম আমাদেরকে দিল না, তোমাকে জিজ্ঞেস করতে বলল।' দাদু শুনে বলল, 'কিরে কি?' তারা বলল, 'কিছুইনা, তোমাদের লাউয়ের ডুগি আছে কিনা ওটা আমাদের দাও।' দাদু বলল, 'কি করবে ওটা?' ঠকরা বলল, 'দেউসি খেলব।' তারপর দাদু বলল, 'আমার কথা গিয়ে বল যে দাদু দিতে বলল।' তখন সবাই দিদার কাছে এসে বলল, 'দিদা দাদু তোমাদের টাকার থলেটা দিতে বলল, শুনে দিদা বলল, 'দিতে বলবে ঠকরা, মিথ্যা কথা বলার আর জায়গা পাও না।' তখন ঠকরা বলল, 'না হলে দাদুকে জিজ্ঞেস করেই দেখ।' দিদা চেচিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'ও বুড়ো তুমি কি এদের টাকার থলেটা দিতে বলেছ।' বুড়ো অস্পষ্টভাবে শুনে জবাব দেয়, 'হ্যাঁ হ্যাঁ দিয়ে দাও ওদের।' ঠকরা বলে, 'কি বলল? দিদা শুনলে না, টাকার থলেটা দিতে বলল।' দিদার তাও বিশ্বাস হয় না। আবার সে বুড়োকে জিজ্ঞেস করে, 'ও বুড়ো টাকার থলেটা দিতে বললে নাকি?' বৃদ্ধ শোনে লাউয়ের ডুগি, সেজন্য সে বলে, 'দাও দাও।' দিদার তাও বিশ্বাস হল না, টাকার থলে বের করে বুড়োকে দেখিয়ে বলল, 'এই টাকা থলে চাচ্ছে। দিব কি?' বুড়ো রেগে হালের লাঠি দেখিয়ে বলতে লাগল, 'শালি বুড়ি, দিয়ে দাও বলছি শুনছো না। হাল ছেড়ে আসলে এই লাঠি তোমার পিঠে ভাঙবো।' তখন রেগে ও আধকান্না অবস্থায় টাকার থলে তাদের দিয়ে দিল। চাষ করে বুড়ো বাড়িতে এলে বুড়ি তাকে জিজ্ঞেস করে, 'আজ তোমার কি হল গো? ঠক ভাইদের টাকার থলে দিতে বললে।' অবাক হয়ে বুড়ো বলল, 'টাকার থলে!' বুড়ি বলল, 'হ্যাঁ টাকার থলে তুমি যে দিতে বললে।' ও তুমি সর্বনাশ করলে— কেন টাকার থলে দিলে। তখন বুড়ি বলল, 'কতবার তোমাকে বললাম এরা টাকার থলে

চাইছে, তুমি আমাকে লাঠি দেখিয়ে বললে দাও দাও। আমি টাকার থলে দিলাম। এখন তুমি বলছ কেন দিলাম? দেখলে ঠকভাইরা ঠকিয়ে নিয়ে গেল। তখন বুড়ো জানায় যে, 'আমাকে বলল লাউয়ের ডুগি দিদাকে দিতে বল। আর তোমাকে বলল টাকার থলে দিতে বলল। যাক ঠকরা।

অনেকদিন পরে একদিন বুড়ো বাজার থেকে অনেক জিনিসপত্র কিনে বাড়ি ফিরছিল ঠক সাতভাইয়ের বাড়ির সামনের রাস্তা ধরে। ঠক ভাইরা দাদুকে দেখে বলল, 'ও দাদু আজ বাজারে কি বিক্রি করলে অনেক জিনিসপত্র কিনে আনলে যে।' বুড়ো মনে মনে ঠক সাতভাই এর উপর রেগেই ছিল এবং সুযোগ পেলে তাদেরও শায়েস্তা করবে ভেবেছিল। আজ দৈব ক্রমে সে সুযোগ তার এসে যাওয়াতে সে মনে মনে বুদ্ধি করে বলল, 'বাড়ির ছাই বিক্রি করতে গিয়েছিলাম আজ।' বাড়ির ছাই এর অনেক দাম বলে সে টাকা দেখালো থলে বের করে। তারপর বাড়ি চলে এল। কয়েকদিন পর ঠক ভাইরা চিন্তাভাবনা করে লজ্জা ভেঙে দাদুর বাড়িতে আবার দেখা করতে গেল এবং 'ও দিদা ও দিদা বলে ডাকতে শুরু করল।' দিদা রেগে বলল ঠকরা আবার কেন এলে? আমাদের সর্বনাশ করতে। দাদু বলল, 'রাগ করো না ওরা আমার কাছে এসেছে। কিসের চিন্তা ওরা আমার ছাই-এর পয়সা খেতে পারবে না। ওরা বাড়ির ছাই বিক্রি করে টাকা ফিরিয়ে দেবে। ঠক ভাইরাও শুনে বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ দিদা রাগ করো না, আমাদের ভুল হয়েছে আর এমন হবে না। দাদুকে এও বলল, 'বাড়িতে তো তাদের ছাই নেই কোথা থেকে তারা ছাই পাবে?' দাদু জানায়, 'তোদের পুরোনো সাতটি ঘর আছে কিনা, সাতটি ঘর জ্বালিয়ে দিলে অনেক ছাই হবে এবং সেগুলি বিক্রি করলে অনেক টাকাও পাবে এবং নতুন ঘরও হবে। আর কিসের চিন্তা? ঠকরা শুনে আনন্দে ও আহ্লাদে বলে ওঠে, 'ঠিক বলছ তো দাদু? দাদু বলল, 'আমি কি মিথ্যা কথা বলছি তোমাদের, ঐ দেখ আমাদের গরুর ঘরটি আছে এখন? ছাই এর জন্য জ্বালিয়ে দিয়েছি। তখন ঠক ভাইরা দাদুকে জিজ্ঞেস করল, 'কোথায় ছাই কিনছে? দাদু জানায়, 'বাজারে লাল টুপি পড়াদের ঘর আছে কিনা? ওখানেই ওরা ছাই কিনে।' সঙ্গে দাদু এও বলল, 'যেদিন পশ্চিম দিক থেকে বাতাস জোড়ে বইবে সেইদিন যেতে হবে ঐদিনই ওরা ছাই কিনে। ওদের ঘরের দিকেই ছাই উড়িয়ে দিতে হবে, আর বলতে হবে 'ছাই নাও, টাকা দাও'। ওরা কিন্তু রেগে যাবে। যত রাগবে তত ছাই উড়িয়ে দিতে হবে। অনেক টাকা পাবে, বন্ধ করে দিলে কিছুই পাবে না। কথা শুনে, 'হবে হবে' বলে সাত ভাই খুশি হয়ে বাড়ি চলে গেল এবং বউদের বলল, 'আর তোমাদের টাকা টাকা করতে হবে না। এখন আমাদের অনেক টাকা হবে। আগুন নিয়ে এসো। শুনে বউরা বলল, আগুন কি করবে? দেখ না

কি করি বলতে বলতে মুহূর্তের মধ্যে সবগুলি ঘর জ্বালিয়ে দিল। বউরা কান্নাকাটি করে বলতে লাগল, 'তোমরা কি পাগল হলে নাকি? আমরা কোথায় থাকব? কারো কথায় কান দিল না সাত ভাই। পোড়া শেষ হলে ছাইগুলি জড়ো করে মহানন্দে সাতভাই ছাই বিক্রি করতে চলল হাটে। ঐদিন পশ্চিমের হাওয়া বইছিল জোড়ে, ওরা দাদুর পরামর্শ মতো এক সারিতে দাঁড়িয়ে থানার সামনে ছাই ওড়াতে শুরু করল। থানার পুলিশ রেগে তাদের বন্ধ করতে বলল, কিন্তু তারা কোন কথাই কান দিল না, শুধু একই সুরে বলে চলল, 'ছাই নাও টাকা দাও।' পুলিশ যতই রাগ করে তারা ততই ছাই উড়িয়ে দেয়। তখন পুলিশ তাদের ধরে পেটাতে পেটাতে থানায় নিয়ে আসে। পুলিশ এরকম আচরণের কারণ জানতে চাইলে তারা দাদুর কথা খুলে বলল। তখন সমস্ত শুনে পুলিশ বলল, 'দাদুর টাকা ঠকিয়ে খেয়েছো, তাই দাদু তোমাদের শাস্তি দিল।' তখন ভাইরা তাদের কাজের জন্য অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা চাইল।

এই লোককথাটিকে যদি টাইপ-মোটিফ ইনডেক্স অনুযায়ী বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে এর টাইপ-মোটিফ হবে নিম্নরূপ—

ক. টাইপ : ৮৪০ মানুষের পাপের শাস্তি

খ. মোটিফ : কে ১০০ প্রতারণার মাধ্যমে লাভ

কে ১৭৯৯ মিথ্যের দ্বারা প্রতারিত করা।

'ঠকভাইদের কথা' লোককথাটি একটি সাধারণ নীতিকথামূলক গল্প। একটি কৃষিজীবী মধ্যবিত্ত পরিবারের কথা এখানে স্থান পেয়েছে। মধ্যবিত্ত মানুষের সরলতার সুযোগ নিয়ে সমাজেরই কিছু ধুরন্ধর ছলবুদ্ধিসম্পন্ন লোক কীভাবে তাদের কষ্টার্জিত অর্থ হাতিয়ে নিয়ে যায় এবং পরবর্তীতে লোভের বশবর্তী হয়ে তারাও কীভাবে সর্বস্ব খুইয়ে শাস্তি পায় তারই বর্ণনা এই লোককথায় পাওয়া যায়। এই লোককথায় দেখানো হয়েছে অন্যায় করলে তাকে শাস্তি পেতেই হবে। ধিমাল সমাজের লোকেরা যাতে অন্যায় থেকে বিরত থাকে তার শিক্ষাই দেওয়া হয়েছে এই নীতিকথাটির মধ্যে দিয়ে।

‘আমা কুলিংকো কাথা’

(মা কোকিলের কথা)

এক গ্রামে একজন ধামী (পুরোহিত) বাস করত। তার দু’জন বউ ছিল। বড় বউ তিনজন ছেলে মেয়ে রেখে মারা যায়। সৎ মা ছেলে মেয়েদের ভালোভাবে দেখাশুনা করত না। এমনকী ঠিক মতো খেতেও দিত না। ফলে মায়ের অনাদরে ছেলে মেয়েদের চরম দুঃখকষ্টে দিন কাটতে লাগল। বাড়ির কাছে জঙ্গলের পাশে একটি পিঠে গাছ ছিল। একদিন খেলতে খেলতে ঐ ছেলে মেয়েরা ঐ পিঠে গাছ দেখতে পেল। গাছে অনেক পিঠে ধরে আছে এবং একটি কোকিল ঐ গাছে বসে আছে। এদিকে ছেলে মেয়েরা ধীরে ধীরে খেতে না পেয়ে দুর্বল হয়ে পড়ল এবং খিদের জ্বালায় পিঠে গাছের তলায় গিয়ে মা কোকিলকে বলল, ‘মা কোকিল, সেদ্ধ শাক, সেদ্ধ ভাত সৎ মা খেতে দেয়।’ ছেলে মেয়েদের কথা শুনে কোকিল পাখির মনে আঘাত লাগে। তাই ছেলেমেয়েদের পেটভরে খাওয়ানোর জন্য গাছ থেকে অনেক পিঠে নীচে ফেলে দিল। ঐ পিঠে খেয়ে ছেলেমেয়েরা খিদে দূর করতে লাগল। খিদে পেলেই তারা গাছের সামনে আসে এবং কোকিল মা গাছ থেকে পিঠে ফেলে দেয়। এভাবে পিঠে খেতে খেতে কয়েকদিনের মধ্যেই ছেলেমেয়েরা হৃষ্টপুষ্ট হয়ে উঠল। এদিকে তাদের সৎ মা হৃষ্টপুষ্ট চেহারা দেখে হিংসে করতে লাগল। সে ভাবতে শুরু করল, আমি তো ঠিক মতো বাচ্চাদের খেতে দিই না, তবুও হৃষ্টপুষ্ট হচ্ছে কেমন করে? তখন একদিন বড় মেয়েকে ডেকে বলল, ‘তোমরা প্রত্যেকদিন কোথায় যাও, কি খাও? আমাকে বলো।’ তখন বড় মেয়ে বলল, ‘আমার মা মরে কোকিল মা হয়েছে। ঐ জঙ্গলের পাশে পিঠে গাছ আছে, মা ওখানে থাকে। আমি আমার ভাই-বোনদের নিয়ে ঐ গাছের সামনে যাই, মাকে বলি, মা আমাদের ভালো করে পেট ভরে না, খিদের ভীষণ জ্বালা, তুমি আমাদের জন্য পিঠে ফেলে দাও। তখন সঙ্গে সঙ্গে আমার মা পিঠে ফেলে দেয়। ঐ পিঠে খাওয়ার জন্য আমরা সব সময় জঙ্গলের পাশে যাই।’ হিংসুটে সৎ মা এই কথা শুনে ভীষণ রেগে গেল এবং ছেলেমেয়েদের পিটিয়ে তাড়িয়ে দিল। শুধু এখানেই থেমে থাকল না, সে ভাবল ঐ গাছকে কেটে দিলে তারা আর পিঠে খেতে পারবে না, তার সঙ্গে মা কোকিলও দূরে চলে যাবে। তার জন্য সে ঠিক করল আগামীকাল সকালে চুপিচুপি গিয়ে কেটে ফেলবে এবং তারপর দেখবে তাদের কোকিল মা কি খাওয়ায়। পরের দিন ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে গাছ কাটার অস্ত্র নিয়ে চুপিচুপি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়ে। ঘন জঙ্গলে ঘেরা রাস্তা ধরে সৎ মা এগিয়ে চলতে চলতে

আবছা অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ তার পা একটি সাপের ওপর গিয়ে পড়ল, অমনি সাপ তাকে দংশন করল। চিৎকার করলেও কেউ শুনতে পেল না। রাস্তার মধ্যেই তার প্রাণ গেল।

এই লোককথাটিকে যদি টাইপ-মোটিফ ইনডেক্স অনুযায়ী বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে এর টাইপ-মোটিফ হবে নিম্নরূপ—

ক. টাইপ : ৪৭৩ খারাপ নারী ও খারাপ সৎ মায়ের শাস্তি

খ. মোটিফ : বি ৪৫০ উপকারী পাখি

বি ৫৭১.৩ মানুষের জন্য পাখি কাজ করে

ই ৬১৩ পাখিরূপে নবজন্ম

এস ৩১ নিষ্ঠুর সৎ মা

এফ ৮১১.১০ পিঠের গাছ

সি ৯৯২ কোনো ভুলের জন্য সর্পদংশনে মৃত্যু

'মা কোকিলের কথা' এটি একটি নীতিকথামূলক লোককথা। এই লোককথায় মানব হৃদয়ের দুটি (নির্মমতা ও সহৃদয়তা) দিককে খুঁজে পাওয়া যায়। ধিমালরা যে সর্বপ্রাণবাদে বিশ্বাসী তার পরিচয়ও এই গল্পে পাওয়া যায়। পাখিরূপে জন্মগ্রহণ করা মায়ের কথা আসলে ধিমালদের পূনর্জন্মে বিশ্বাসকেই তুলে ধরে। সৎ মায়ের সর্পদংশনে মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদকেই তুলে ধরা হয়েছে। অন্যায় করলে তার পরিণতি যে ভয়ঙ্কর হয় সেই কথাকেই ধিমালরা বুঝিয়েছে এই লোককথাটির মধ্যে দিয়ে।

'সোনা ময়না জিহাঁকো কাথা'

(সোনা ময়না পাখির কথা)

এক গ্রামে এক বড় জমিদার ছিল। তাঁর সোনা ময়না নামে একটি ময়না পাখি ছিল। ময়না মানুষের মতো কথা বলতে পারত। একদিন জমিদার তার প্রজাদের ডেকে বলল, 'আমি কিছুদিনের জন্য বিদেশে যাচ্ছি, আমার সোনা ময়না জামিদার হয়ে থাকবে। ও যা যা করতে বলবে তাই তাই করবে।' এই কথা শুনে প্রজারা বলল, 'ঠিক আছে জমিদার মশায় আমরা ময়না পাখির

কথা শুনে কাজ করবো।' তখন নিশ্চিন্তে ময়না পাখিকে জমিদারির দায়িত্ব দিয়ে জমিদার কিছুদিনের জন্য বিদেশ চলে গেলেন। ময়না ভালোভাবেই প্রজাদের দেখাশুনা করছিল। কারো কোনো সমস্যা নেই। দু'বছর পর একদিন খবর এল জমিদার ফিরে আসছে। শুনে প্রজারা সবাই মহাখুশি। ধান ভালো হয়েছে এবার। ধান পেকে গেলে সমস্ত প্রজারা ময়না পাখির কাছে আসে কাটার অনুমতি নিতে। ময়না পাখি বলে, 'ধান কাটার সময় হয় নাই।' এভাবে বলতে বলতে ধান পেকে সমস্ত শিষ মাটিতে পড়ে যাওয়ার উপক্রম হল। হঠাৎ একদিন ময়না সমস্ত প্রজাদের বলল, 'সবাই ধান কেটে এক জায়গায় জমা করো।' সমস্ত প্রজারা ধান কেটে এক জায়গায় জমা করল। তখন ময়না পাখি বলল, 'এবার আগুন লাগিয়ে দাও।' সবাই অবাক হয়ে বলল, 'ময়না পাখি ধানের গাদায় আগুন লাগিয়ে দিতে বলল, তাহলে আমরা খাব কি?' শুনে ময়না পাখি তাদের জানায়, 'জমিদার তাদের কি বলেছিল? আমি যা করতে বলব, তাই তোমরা করবে।' তখন প্রজারা বাধ্য হয়ে ধানের গোলায় আগুন লাগিয়ে দিল। সব ধান মুহূর্তের মধ্যে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। সোনা ময়না প্রজাদের ডেকে বলল, 'ছাইগুলি জড়ো করে ধানের গোলায় রেখে দাও। জমিদার ময়নার কথায় সবাই ধানের ছাই ঘরে ধানের গোলায় রেখে দিল। সমস্ত প্রজারই মন খারাপ এবং একে অপরকে বলাবলি করছে, আমাদের জমিদার কি কাজ করল রে? জঙ্গলের ময়না পাখিকে জমিদার বানিয়ে রাখল। এ বছর জমিদারের প্রজারা কি খাবে? ধানের ছাই। সবাই খুব রেগে আছে। ঠিক এই সময়ে জমিদার আসার খবর এলো। জমিদারকে এই খবর দেওয়ার জন্য রাস্তার মধ্যেই কাঁদতে কাঁদতে অপেক্ষা করতে লাগল। জমিদার এসে তাঁর প্রজাদের জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা কাঁদছো কেন?' সবাই উত্তরে জানাল, 'জমিদার মশায় আপনার সোনার ময়না এ বছর সর্বনাশ করেছে। সব ধান জমা করে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। কি খাব আমরা? শুনে জমিদার বললেন, 'তোমরা কেন এ কাজ করলে?' তারপর প্রজারা উত্তর দিল, 'আপনি বলে গেলেন, যেমন যেমন সোনা ময়না বলবে তেমন তেমন করবে, তার কথা যেন নড়চড় না হয়। তাই আমরা আপনার কথা ধরে সোনা ময়নার কথা রেখেছি।' এই কথা শুনে জমিদারের মাথা রাগে বিগড়ে গেল। এমন সময় ময়না পাখিও জমিদার আসার খবর পেয়ে উড়ে এসে জমিদারের কাঁধে বসল। জমিদার আগে থেকেই রাগে ছটফট করছিল তাই সোনা ময়নাকে ধরে মাটিতে আছাড় মারল। ফলে সোনা ময়না ছটফট করতে করতে মারা গেল। মন খারাপ করে জমিদার ঘরে ঢুকলো। প্রজারা তাকে বলতে লাগল, এখন আমরা কি খাব জমিদার মশায়? এমন সময় জমিদার গিন্নী এসে

খবর দিলেন, 'তোমার ধানের গোলা এ বছর তোমার সোনার ময়না সোনায় ভর্তি করে রেখেছে।' তখন জমিদার গোলা দেখতে গেল। ধানের গোলা দেখে জমিদার চোখ বড় বড় করে কপাল চাপড়ে জোড়ে জোড়ে কাঁদতে লাগল এবং বলতে লাগল কি কাজ করলাম আমি, কি কাজ করলাম। জমিদারের কান্না দেখে সবাই কাঁদতে লাগল। জমিদার বলল 'তোমরা কাঁদছো কেন? তোমরা হাস, আমাকে কাঁদতে দাও। যাও ধানের গোলা দেখে এসো কি করেছে আমার সোনা ময়না। সবাই গোলা দেখছে আর বলছে সোনা ময়না, সোনা ময়না।' সত্যি সত্যি ধানের সব ছাই সোনা হয়ে গেছে। তার জন্য বলা হয়, জেনেশুনে কাজ করতে হয়।

এই লোককথাটিকে যদি টাইপ-মোটিফ ইনডেক্স অনুযায়ী বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে এর টাইপ-মোটিফ হবে নিম্নরূপ—

ক. টাইপ : ৫৫৩ সাহায্যকারী পাখি

খ. মোটিফ : বি ২১১.৩ কথা বলা পাখি

বি ৪৫০ উপকারী পাখি

বি ৫৮১.১ পাখি মানুষকে সম্পদ দেয়।

'সোনা ময়না পাখির কথা' লোককথাটি নীতিকথামূলক এই লোককথার মধ্যে দিয়ে দেখানো হয়েছে যে না বুঝে, না জেনে অস্থির চিত্তে কোনকিছু করলে তার ফল ভালো হয় না। পরে তার জন্য অনুতাপ করতে হয়। সেই জন্য যে কোন কাজ করার আগে ভাবতে হয়। হঠকারিতাই কাল প্রবেশের মূল কারণ। রাজা সোনার পাখিকে মেরে আসলে নিজেরই ক্ষতি করেছে। তাই কোন কাজের পরিণতি না দেখে তার সিদ্ধান্ত নেওয়া যে ঠিক নয় এই শিক্ষাই দেওয়া হয়েছে এই লোককথাটির মধ্যে দিয়ে।

'নৈহা আর আজুকো কাথা'

(বানর ও ঠাকুরদাদার গল্প)

অনেক দিন আগের কথা তখন চারিদিকে জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। জঙ্গলের পাশে এক বৃদ্ধ ও এক বৃদ্ধা জমিতে কচু লাগাচ্ছিল। এমন সময় জঙ্গল থেকে কতকগুলি বানর বেরিয়ে এসে

বলল, 'ও ঠাকুরদা, ও ঠাকুমা, তোমরা জমিতে কি লাগাচ্ছ?' তখন ঠাকুরদা ও ঠাকুমা জবাব দিল, 'আমরা কচু লাগাচ্ছি, কচু।' বানররা তাদেরকে বলল, 'এভাবে কচু লাগালে দশমাস সময় লাগবে। আর আমার কথা শুনলে তোমরা কয়েকদিনের মধ্যেই কচু খেতে পারবে। ঠাকুরদাদা ও ঠাকুমা বানরের কথা শুনে অবাক হয়ে বলল, 'তাই নাকি?' তখন বানর বলল, 'কত লোক আমার কথা শুনে কচু খেয়েছে তুমি শোননি ঠাকুরদাদা? কি বলছ?' তখন ঠাকুরদা বলল, 'না আমি শুনিনি। আচ্ছা বলো তো, কীভাবে লাগাতে হয়?' তখন বানর বলল, 'কচুগুলিকে প্রথমে ভালোভাবে সেদ্ধ করতে হবে, তারপর সেগুলিকে কলার পাতায় বেঁধে পুঁটলি বানিয়ে লাগাতে হবে। তারপর দেখবে কেমন সুন্দর কচু হয়।' তারপর ঠাকুরদা ও ঠাকুমা বানরের কথা মতো কচু লাগানো বন্ধ করে সমস্ত কচুকে আবার বাড়ি থেকে সেদ্ধ করে এনে কলার পাতায় মুড়িয়ে লাগিয়ে দিল। বানর এসে ঠাকুরদা ও ঠাকুমার অনুপস্থিতিতে সমস্ত সেদ্ধ কচু খেয়ে কলাপাতায় পায়খানা করে পুঁতে রেখে দিল। কয়েকদিন পরে জমিতে গিয়ে ঠাকুরদা ও ঠাকুমা দেখতে পেল জমিতে কচু হয়নি, মাটি খুঁড়ে দেখে কলাপাতায় বানরের পায়খানা করে ঢেকে রেখেছে। তখন ঠাকুরদা রেগে মনে মনে বলে, 'আমার কচু বানরেরা খেল, একদিন ওদের আচ্ছা শিক্ষা দেবো।' অনেকদিন পরে একদিন বুদ্ধি করে ঠাকুরদাদা ঘরে শুয়ে আছে। ঠাকুরমা মিথ্যা ভান করে বারান্দায় কাঁদছে। তার কান্না শুনে বানরগুলি এসে বলল, 'ঠাকুমা কি হয়েছে তোমার? কাঁদছ কেন?' ঠাকুমা বলল, 'তোমাদের ঠাকুরদাদা আর পৃথিবীতে নেই। আজ সকালে কি যে হল হঠাৎ মরে গেল। ওঝা ডাকতে পারিনি। একা মানুষ কি করব কি না করব— ভাবতে ভাবতেই এমন হয়ে গেল। এসো দেখতে।' একজন করে বানর ঘরে ঢোকে আর বলে ওঠে একজন এলো রে বুড়ো, দু'জন এলো রে বুড়ো। 'ঠাকুরদাদা লাঠি নিয়ে চুপচাপ শুয়ে আছে বানর মারার জন্য। বানরগুলি ঠাকুরমার সংখ্যা গণনা দেখে বলে তুমি এরকম গুনছো কেন?' ঠাকুমা তখন উত্তরে জানায়, 'আমাকে হিসেব রাখতে হবে না, শ্রাদ্ধের ভোজ খাওয়ার জন্য তোমাদেরকে তো আমাকে বলতে হবে কি না।' বানর খুশি হয়ে বলে, 'হ্যাঁ হ্যাঁ।' ঠাকুমা পাঁচ-ছয়-সাত করে 'সবকটি এলো রে' বলে বাইরে থেকে ঘরের দরজা শক্ত করে লাগিয়ে দিল। আর ঠাকুরদা লাঠি নিয়ে উঠে বলল, 'তোমরা আমার কচু খেয়েছো আজ আমি তোমাদের 'গু' বের করব' বলতে বলতে সবগুলি বানরকে পিটিয়ে মেরে ফেলল। কিন্তু তার মধ্যে একটি ছিল খুব চালাক বানর সে লাঠির এক ঘা খেতেই মরার ভান করে শুয়ে পড়ল। যখন ঠাকুমা দরজা খুলে দিল অমনি সে এক লাফে

বাইরে পালিয়ে গেল।

এই লোককথাটিকে যদি টাইপ-মোটিফ ইনডেক্স অনুযায়ী বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে এর টাইপ-মোটিফ হবে নিম্নরূপ—

ক. টাইপ : ১৬০ গ কৃতজ্ঞ মানুষ অকৃতজ্ঞ পশু

খ. মোটিফ : বি ২১১.২.১০ কথা বলা বানর

'বানর ও ঠাকুরদাদার গল্প' লোককথাটির মধ্যে দিয়ে আসলে শোষক ও শোষিত শ্রেণিকেই তুলে ধরা হয়েছে। লোককথাটিতে বানর হল শোষক শ্রেণির প্রতিনিধি আর কৃষক হল শোষিত শ্রেণির। শোষক শ্রেণি সমাজের নিচে থাকা মানুষগুলিকে তো ভালো পরামর্শ দেয়ই না বরং খারাপ পরামর্শ দিয়ে তাদের সর্বনাশের পথে ঠেলে দেয়। এবং নিজেরাও তাদের সর্বনাশের খেলায় মেতে ওঠে। কিন্তু শোষিত শ্রেণি শোষিত হতে হতে যখন নিঃস্ব হয়ে যায় তখন তারা সম্মিলিত ভাবে প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। তখন শোষক শ্রেণিকেও হার মানতে হয় শোষিত শ্রেণির কাছে।

'চুইতি পিকাকো চান রাজাকো চান'

(তেলির ছেলে ও রাজার ছেলে)

এক রাজার ছেলে ও এক তেলির ছেলের একই জায়গায় জন্ম হয়েছিল। রাজার ছেলে কাজলের মতো কালো আর তেলির ছেলে সুন্দর দেখতে হয়েছিল। ধাইমারা মনে মনে ভাবল এটা কেমন হল? রাজার ছেলে কালো কুৎসিত আর তেলির ছেলে সুন্দর। এটা তাদের ঠিক মেনে নিতে কষ্ট হলো। তাই তারা রাজার ছেলে তেলির বউকে আর তেলির ছেলে রানীর হাতে তুলে দিল। রাজার ছেলে তেলির বাড়িতে বড় হচ্ছে। একই মাস্টারের কাছে ওরা রাজবাড়িতে লেখা-পড়া শিখছে। তেলির ছেলে পড়াশুনায় তীক্ষ্ণ আর রাজার ছেলে ততটা নয়। খেলাধূলাতেও তেলির ছেলে বিশেষ পারদর্শী আর রাজার ছেলে খেলার সময় গাছ খুঁজে বেড়ায় এবং বন্ধুদের বলে, এই গাছ দিয়ে তেলের ঘানি হবে। তেলির ছেলে প্রায় সব সময় রাজা-রাজা খেলা পছন্দ করে। সে নিজে রাজা হয়ে বসে আর সেখানে রাজার ছেলে হয় মন্ত্রী। একদিন খেলতে খেলতে খেলার

রাজা ও তার মন্ত্রী ও সৈন্যরা দেখল ঘোড়ায় চড়ে কারা যেন আসছে। খেলার সৈন্যরা তাদের ঘিরে ফেলল এবং বলল 'আমাদের রাজাকে প্রণাম করে যাও এবং বল এখানে কেন এসেছো?' ঘোড়ায় বসে থাকা সাতজন ছোট সৈন্যদের হাতে পাথর দেখে ভয়ে ভয়ে বলল, 'চল কোথায় আছে তোমাদের রাজা। সবাই তাদেরকে ছোট খেলার রাজার কাছে নিয়ে এল এবং মন্ত্রী তাদেরকে বলল, 'আমাদের রাজাকে নমস্কার কর এবং কেন, কি প্রয়োজনে এখানে এসেছ? বল। তখন সাতভাই এর মধ্যে বড়জন বলল, 'আমরা দেশ-বিদেশ ঘুরে এসেছি, একটি বিচারের জন্য কিন্তু কেউই সঠিক বিচার করতে পারেনি, তাই এই রাজার রাজ্যে এসেছি সঠিক বিচারের আশায়। তেলির ছেলে শুনে বলল, কি সমস্যা তোমাদের? তখন বড় ভাই বলল, 'আমার বাবা মরার সময় বলে যায়, তোমরা ছয়ভাই মিলে সম্পত্তি ভাগ করে নিও, এক ভাইকে দিও না, ও তোমাদের রক্তের সম্পর্কিত নয়।' কিন্তু আমাদের সাতভাই এর মধ্যে কে রক্ত সম্পর্কিত ভাই নয় তা আমরা বুঝতে পারছি না। তাই দেশ-বিদেশ ঘুরে এলাম তা কেউই বলতে পারল না। বিস্তারিত শুনে তেলির ছেলে বলল, 'রাজার রাজ দরবারে যাও রাজা এর বিচার করবে। রাজা না পারলে আমি এই সমস্যার সমাধান করব। তখন সাত ভাইরা রাজ দরবারে এসে রাজার সামনে তাদের সমস্যার কথা খুলে বলল। রাজা মন্ত্রীদের সঙ্গে আলোচনা করেও সমস্যার সমাধান করতে পারল না। তখন রাজপুত্র রাজাকে বলল, 'বাবা আমাদের খেলার রাজা এর সমাধান করতে পারবে। রাজা শুনে বলল, 'খেলার রাজা মানে।' রাজপুত্র তখন বলল, 'আমরা খেলার মাঠে সব সময় রাজা রাজা খেলি। আমাদের রাজা হয় তেলির ছেলে, আমরা হই প্রজা আর আমাদের মন্ত্রীর ছেলে হয় মন্ত্রী। তেলির ছেলে বুদ্ধিদীপ্ত, ভয়শূন্য রাজার ছেলের মতো। একথা শুনে রাজা মনে মনে বলে, 'আমার ছেলের রাজা হওয়ার দরকার ছিল। তেলির ছেলে রাজা হয় কেন?' তখন সে তেলির ছেলেকে ডেকে বলে, 'বাবু, তুমি কি এই সমস্যার সমাধান করতে পারবে?' সে বলল, 'আপনি মহারাজ, হুকুম দিলে করতে পারব। আর লাগবে আপনাদের সবার আশীর্বাদ।' রাজা তার কথা শুনে বলল, 'ঠিক আছে সমস্যা সমাধান করো।' তখন তেলির ছেলে বলল, 'আমার বিচার ঠিক হলে সবাই মানবেন তো?' তখন রাজা, মন্ত্রী, সাতভাইরা সবাই 'হ্যাঁ হ্যাঁ' বলে সম্মতি জানালো। তখন তেলির ছেলে এক এক করে একটি কুঠুরির মধ্যে নিয়ে গিয়ে তার হাতে তলোয়ার দিয়ে বলল, 'এই তলোয়ার দিয়ে তোমার ছয় ভাইকে কাটতে পারলে এই সম্পত্তি পুরোটাই তুমি পাবে। তুমি পারবে কি না বলো? বড় ভাই উত্তর দিল, 'আমার সম্পত্তির প্রয়োজন নেই, তবুও আমি আমার

ভাইদের কাটতে পারব না।' এরূপ করতে করতে একজন বের হল সে বলল, 'সত্যি সত্যি সব সম্পত্তি যদি আমার হয় তাহলে সবাইকে কাটতে পারব।' তখন খেলার রাজা রাজার কাছে এসে জানাল যে সে সমস্যার সমাধান করে ফেলেছে। ভাইদের মধ্যে পঞ্চম ভাই এদের রক্তের সম্পর্কিত ভাই নয়। তখন অবাক বিস্ময়ে রাজা তার কাছে জানতে চাইলো কি করে চিনলো? তখন খেলার রাজা জানায় যে, সে একটি তলোয়ার দিয়ে চুপি চুপি তাদের সমস্ত ভাইদেরই একই কথা বলেছিল, 'তুমি যদি ছয় ভাইকে কাটতে পারো তাহলে তুমি সমস্ত সম্পত্তি একাই পাবে। সবাই বলল তাদের সম্পত্তির দরকার নেই তবুও ভাইদের কাটতে পারব না। শুধু পঞ্চম ভাই বলল, 'সে যদি সমস্ত সম্পত্তি পায় তাহলে সে অন্যান্য সবাইকে কাটতে পারবে।' রাজা তার বিচারে খুশি হল। ভাইরা তাদের নকল ভাইকে চিনতে পারল। রাজা অবাক হয়ে বলল, 'এ তেলির ছেলে কি করে হয় সন্দেহ হওয়ায় সে মন্ত্রীকে বলল, 'রানির প্রসবের দিনে কে কে সেখানে ছিল তাদের ডাকো। তারাই বলবে এ কার ছেলে।' রাজার কথা শুনে সবাই এলো। রাজা বলল, 'সত্যি কথা বল কোন ভয় নেই, আমার রানির প্রসবের দিন কি কি হয়েছে?' তখন দাইমারা রাজার পায়ে পড়ে গিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'আমাদের ভুল হয়ে গেছে মাপ করো। এই তেলির ছেলেই আপনার ছেলে আর রাজপুত্র তেলির ছেলে।' রাজা ধমক দিয়ে বলল, 'এটা কেমন করে হলো?' তখন ধাইমা জানায়, 'আপনার ছেলে জন্মানোর সময় কাজলের মতো কালো কুৎসিত দেখতে হয়েছিল, আর তেলির ছেলে হয়েছিল সুন্দর। আমরা ভেবেছিলাম রাজার ছেলে সুন্দর না হলে চলে। তার জন্যই আমরা পাল্টাপাল্টি করে দিয়েছি। এখন আমাদের কি দণ্ড দেবেন দিন।' শুনে রাজা বললেন, 'আর এরকম কাজ করো না। তোমরা সত্য কথা বললে তাই তোমাদের ক্ষমা করে দিলাম।' তারপর সত্যিকারের রাজার ছেলে রাজকুমার হল তেলির ছেলেকে তেলি গ্রহণ করল।

এই লোককথাটিকে যদি টাইপ-মোটিফ ইনডেক্স অনুযায়ী বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে এর টাইপ-মোটিফ হবে নিম্নরূপ—

ক. টাইপ : ৯২১ রাজা ও তেলির ছেলে

খ. মোটিফ : এইচ ৪১.৫ অপরিচিত বালক তার কাজকর্মে রাজপুত্র বলে চেনা

'তেলির ছেলে ও রাজার ছেলে' লোককথাটির মধ্যে দিয়ে ধিমালরা বোঝাতে চেয়েছে যে মানুষের বাহ্যিক রূপ নয় আভ্যন্তরীণ রূপ অর্থাৎ গুণই প্রধান। বাহ্যিক পরিবেশ যা নিয়ন্ত্রণ

করতে পারে না। তাই রাজার ছেলে তেলির ঘরে থাকলেও রাজার মতো আচরণ করে। আর তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় দেয়। ধিমালরা এখানে কর্মের থেকে জন্মগত গুণকেই বেশি প্রাধান্য দিয়েছে। তাছাড়া সম্পত্তির ধারণা থেকেই যে মানুষের মধ্যে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি তা এই লোককথাটির মধ্যে দিয়ে বোঝানো হয়েছে।

ব্রাহ্মণ নাহাপু টংটংকা কাথা

(ব্রাহ্মণের নাক উঁচু হওয়ার গল্প)

একগ্রামে এক ব্রাহ্মণ ও তার ব্রাহ্মণী বাস করতো। একদিন ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণকে বলল, 'অন্যান্য ব্রাহ্মণদের ভালো ভালো ঘর বাড়ি, আমাদের কিছুই নেই। তুমি জঙ্গলে গিয়ে তপস্যা কর বড়লোক হওয়ার জন্য।' বৌ-এর কথা শুনে ব্রাহ্মণ জঙ্গলে গিয়ে তপস্যা শুরু করল। তপস্যায় সন্তুষ্ট হয়ে দেবতা আবির্ভূত হলেন এবং ব্রাহ্মণকে বললেন, 'কি চাই তোমার বল।' তখন সে বলল 'আমার ব্রাহ্মণী বউ ধনী হতে চায়, তার জন্যই আমি তপস্যা করছি।' তখন দেবতা তাকে তিনটি ফল দিল এবং বলল, 'যা দরকার বলে ফল ফেলে দেবে তাই হবে।' সে খুশি হয়ে বাড়ি ফিরে এল। তার ব্রাহ্মণী বলল, 'তোমার তপস্যা পূর্ণ হয়েছে; এখন তুমি আমার মনের আশা পূর্ণ কর।' শুনে ব্রাহ্মণ বলল, 'আর চিন্তা নেই দেবতা আমাকে তিনটি ফল দিয়েছে। যা দরকার তাই বলে ফেলে দিলেই হবে। তোমার কি দরকার। রাতে শুয়ে ব্রাহ্মণী ব্রাহ্মণকে বলে, 'দেখো ব্রাহ্মণ আমরা তো ধনী হচ্ছি। সুতরাং আমাদের নাক উঁচু হওয়া দরকার।' ব্রাহ্মণ বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ ঠিক আছে আমাদের উঁচু নাক হোক' বলে একটি ফল ফেলে দিল। তারপর ঘুমিয়ে পড়ল। সকাল বেলায় ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণী উঠতে পারছে না— দু'জনের নাক বড় হয়ে পুরো ঘর ভরে গেছে। হাত দিয়ে দেখছে বিরাট নাক। ব্রাহ্মণ বলল, ব্রাহ্মণী এখন কি করবে? এত বড় নাক হল উঠতে পারছি না। ব্রাহ্মণীরও একই দশা। তাই ব্রাহ্মণী আর একটা ফল ফেলে দিতে বলে যাতে নাক ছোট হয়ে যায়। তখন একটি ফল ফেলে দিল আর সঙ্গে সঙ্গে তাদের নাক খুব ছোট হয়ে ভিতরে ঢুকে গেল। আঙুল দিয়ে দেখে নাক তো একেবারে ভেতরে ঢুকে গেছে, 'মানুষ কি বলবে? তাড়াতাড়ি একটি ফল ফেলে দাও।' তখন একেবারে শেষের ফলটি ব্রাহ্মণ ফেলে দিয়ে বলল, 'যেমন ছিল আমাদের নাক তেমনি হোক।' সঙ্গে সঙ্গে তাদের নাক পূর্বের মতো হয়ে রইল।

এই লোককথাটিকে যদি টাইপ-মোটিফ ইনডেক্স অনুযায়ী বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে এর টাইপ-মোটিফ হবে নিম্নরূপ—

ক. টাইপ : ৭৫০ গ হাস্যকর প্রার্থনা

খ. মোটিফ : এল ৪২৭ গরীবের আকাশ ছোঁয়া বাসনা

ডি ৮১১ দেবতার কাছ থেকে জাদুবস্তু পাওয়া।

'ব্রাহ্মণের নাক উঁচু হওয়ার গল্প' এই লোককথাটি একটি নীতিকথামূলক লোককথা। এই লোককথা থেকে জানা যায় যে ধিমাল সমাজের মধ্যে এক বিশেষ শ্রেণির মানুষ রয়েছে যারা নিজেদের বিশেষ অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন বলে মনে করে। ফলে তারা অসম্ভবকেও সম্ভব করার দিকে প্রয়াসী হয়। কিন্তু ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণীর আকাশ ছোঁয়া কল্পনা বাস্তবায়িত হয় না। ফলে লোককথাটিতে এটাই বোঝানো হয়েছে যে প্রকৃতির নিয়মের বিরুদ্ধে কোন কাজ করলে তা সফল হয় না। আর যার যতটুকু আছে তার মধ্যে থেকেই সুখ খুঁজে নিতে হয়।

কাথা ধুইকা উনথুর

(কথা বলা পাথর)

দেয়া আর নেয়া নামে দুই বন্ধু ছিল। ছোটবেলা থেকেই তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব। কিন্তু বিয়ের পর নেয়া শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে বউ-এর সঙ্গে সংসার করতে থাকে, ফলে দেয়ার সঙ্গে নেয়ার অনেক দিন সাক্ষাৎ নেই। দেয়ার একদিন ইচ্ছে হল বন্ধুকে দেখতে। তাই সে বন্ধুর বাড়ি যাওয়ার উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ল। রাস্তায় যেতে যেতে সে এক বৃদ্ধাকে দেখতে পেল। কাছে যেতেই বৃদ্ধা তাকে বলল, 'বাবু আমি আর হাঁটতে পারছি না, আমার এই পোঁটলাটা সামনে নদী পর্যন্ত পৌঁছে দিলে অনেক উপকার হয়।' দেয়া ছিল খুবই দয়ালু, তাই আর না করতে পারল না। সে নদী পর্যন্ত বৃদ্ধার পোঁটলা পৌঁছে দিল। তখন বৃদ্ধা খুশি হয়ে বলল, 'তুমি আমার অনেক উপকার করলে, তোমাকে আমি কি দিই?' তখন বৃদ্ধা ভাবতে ভাবতে বলল, 'এই নদীর জলে তুমি একটি পাথর চাও। যদি নদীমাতা তোমাকে পাথর দেয়, তাহলে তোমার আর দুঃখ থাকবে না। তুমি যা চাইবে তাই পাবে। টাকা চাইলে টাকাও পাবে।' দেয়া তখন বৃদ্ধার কথা মতো নদীর জলের দিকে হাত

জোড় করে পাথরের জন্য প্রার্থনা জানালো। আর সঙ্গে সঙ্গে একটি সাদা পাথর তার হাতে এসে পড়ল। তখন মহানন্দে দেয়া তার বন্ধু নেয়ার বাড়িতে এসে উপস্থিত হলো। বন্ধু নেয়ার সংসার ভালো ছিল না। কোনরকমে একটু-আধটু খেয়ে দিন চলে যাচ্ছিল। তাই অনেকদিন পরে বন্ধু এলেও তার আগের মতো আন্তরিকতা আর নেই। বন্ধু নেয়া তার বৌকে বলল কি করবো? হাতে টাকা পয়সা নেই, নেয়ার বৌও জানাল কি করি? ঘরে চালও তো নেই। এমন সময় দেয়া তাদের দুজনের কথাগুলি শুনে ফেলে বলল, 'কত টাকা লাগবে? কি কি আনবে বলো? চিন্তার কোন কারণ নেই আমার কাছে টাকার পাথর আছে। সাদা কাপড় নিয়ে এসো।' সঙ্গে সঙ্গে নেয়ার বউ সাদা কাপড় এনে দিল, দেয়া ঐ সাদা কাপড় দিয়ে পাথরটিকে ঢেকে বলল, 'এই পাথর আমাকে তিন টাকা দাও। এখন আমার প্রয়োজন।' বলতে বলতে সেখানে তিন টাকা চলে এল। এই দেখে বন্ধু নেয়া ও তার বউ অবাক হয়ে গেল। তিন টাকা পেয়ে নেয়া হাট থেকে চাল, মাংস নিয়ে এল এবং রাতে সবাই মিলে মহানন্দে খাবার খেল। এরপর দেয়া রাতে ঘুমিয়ে পরলে নেয়া ও তার বউ পরামর্শ করতে লাগল কী করে ঐ সাদা পাথর নেওয়া যায়। নেয়ার বউ বলল, 'এই পাথর চুরি করে নিতে পারলে আর আমাদের কিছুই করতে হবে না। আমরা রাজা রানির হালে থাকবো।' নেয়া বুদ্ধি বের করলো বন্ধুকে তিন-চার দিন ভুলিয়ে রাখতে হবে এবং সুযোগ বুঝে পাথরটি হাতিয়ে নিতে হবে। এর পরদিন থেকেই নেয়া বন্ধুকে খুবই খাতির করতে শুরু করলো, গ্রামের আশপাশ ঘুরিয়ে দেখাল, সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল, খাবার দাবারেও যেন জামাই আদর। এভাবে দেয়ারও একঘেঁয়েমির জীবনে যেন বৈচিত্র্য এসেছে তাই সেও আর বাড়ি ফেরার জন্য ব্যস্ততা দেখাল না। একদিন সারাদিন বন্ধুর সঙ্গে ঘুরে ঘুরে ক্লান্তিতে ও অবসন্নতায় দেয়া রাতে যেন মরার মতো ঘুমিয়ে পড়লো— আর এই ফাঁকে নেয়া ও তার বউ পাথর চুরি করে লুকিয়ে রাখলো। সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখে পাথর নেই। নেয়া ও নেয়ার বউ না জানার ভান করে অবাক হয়ে বলল, 'বন্ধু কোথায় রাখলে এত সুন্দর পাথরটি হারিয়ে ফেললে নাকি? এখন কি হবে?' দেয়া পাথর হারিয়ে মনের দুঃখে বাড়ি ফিরে গেল।

তার বন্ধু নেয়া ও তার বউ টাকার পাথর চুরি করে খুব ধনী হয়ে গেল। এভাবে কয়েক বছর কেটে গেল। দেয়া তার পাথর হারানোর দুঃখ প্রায় ভুলেই গেছে। সে আবার একদিন বন্ধুকে দেখার জন্য যাচ্ছিল। আবার রাস্তায় এক বৃদ্ধার সঙ্গে তার দেখা হল ঐ বৃদ্ধাও তাকে বলল, 'বাবু এই পোঁটলা আমাকে নদী পর্যন্ত পৌঁছে দাও না। আমি আর নিতে পারছি না।' তখন দেয়া নদী

পর্যন্ত বৃদ্ধার পোঁটলা পৌঁছে দিল। বৃদ্ধ তখন খুশি হয়ে বলল, 'তোমাকে কি দিই। তুমি এক কাজ করো- তুমি জোড় হাত করে এই নদীর জলকে বলো একটি পাথর দিতে, ও তোমাকে পাথর দিলে এই পাথর তোমাকে কিছুই দেবে না। শুধু কথা বলে বলে ভুলিয়ে রাখবে।' বৃদ্ধা যেমন যেমন করতে বলল দেয়া তেমন তেমনই করল। ফলে আগের মতো এবারও সে একটি পাথর পেল। সে পাথরকে বলল, 'এ পাথর তুমি আমাকে একটি টাকা দাও তো।' পাথরটি গল্প জুড়ে বলল—

একটি টাকা কেন দুইটি টাকা দেবো
আজকে কেন কালকে দেবো।

এতে দেয়া খুশি হয়ে তার বন্ধুর বাড়ির দিকে পা বাড়াল। সন্ধ্যার আগে এসে দেয়া তার বন্ধুর বাড়ি পৌঁছে গেল। বন্ধু নেয়া এখন আর আগের মতো নেই। বেশ ধনী হয়েছে পাড়ায় নাম ডাকও হয়েছে তার যথেষ্ট। বন্ধুকে দেখে খুশি হল নেয়া। দেয়াকে ভালো ভালো খাওয়ালো। রাতে খাওয়ার পর গল্পগুজব করার সময় দেয়া বলল, বন্ধু টাকা দেওয়া পাথরকে হারিয়ে আমার দুঃখ নেই এখন আমি তার মাকে পেয়েছি। দেখ বলে সে পকেট থেকে বের করে দেখাল দুজনকেই এবং বলল এই পাথর টাকাও দেয় ও কথাও বলতে পারে। তারা শুনে অবাক হয়ে গেল। এই দেখ বলে প্রণাম করে বলল, 'এই টাকা দেওয়া পাথরের মাতা আমাকে একটি টাকা দাও। বলতে বলতেই পাথরটি বলতে শুরু করল—

'একটি কেন দুইটি দেব
আজকে কেন কালকে দেব।'

বন্ধু নেয়া ও তার বউ এই দেখে মনে মনে ফন্দি আঁটে কি করে এই পাথরটি হাসিল করা যায়, যেটা আগেরটার থেকেও মূল্যবান। খেয়ে দেয়ে বন্ধু ঘুমিয়ে পড়ল। বন্ধু নেয়া ও তার বউয়ের কিছুতেই ঘুম পেল না। তাদের মাথায় একই চিন্তা কীভাবে কথা বলা পাথরটি সরানো যায়। নেয়া তার বউকে বলে, 'আমাদের টাকা দেওয়ার পাথর বের কর তো বউ। বউ বলে, 'কেন কি করবে?' জানতে চাইলে নেয়া জানায়, 'বন্ধু ঘুমিয়ে পড়লে এই পাথর তার কাছে রেখে কথা বলা পাথরটি নিয়ে আসতে হবে। ওই পাথর অনেক কাজে লাগবে।' শুনে তার বউও বলল, 'আমিও ওটাই মনে মনে চিন্তা করছিলাম।' নেয়া তার বউকে বলল, 'আচ্ছা দেখে এসো তো একবার আমার বন্ধু

ঘুমিয়েছে কিনা?' গিয়ে দেখে দেয়া হাতে পাথর নিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। দেয়া যে ঘুমের ভান করে আছে তা কেউই বুঝতে পারল না। স্বামী ও স্ত্রী দুজনে বলাবলি করছে ভালোভাবে ডাকতে হবে। ভালো করে ঘুমোলে জাগবে না— আর ঐ ফাঁকে হাত থেকে পাথরটি নিয়ে এই পাথর ধরিয়ে দিতে হবে। একথা দেয়া চুপিচুপি শুনতে পায়। তাই সে আগের থেকেই সচেতন ছিল। তাই বন্ধু ও বন্ধুর বউ এর ডাক শুনেও সে কোন সাড়া দিল না। বুঝতে পারল যে তার বন্ধু আস্তে আস্তে তার কাছে গিয়ে তার হাত থেকে কথাবলা পাথর নিয়ে টাকা দেওয়া পাথরটি ধরিয়ে দিল। সেও টাকা দেওয়া পাথর পেয়ে শক্ত করে ধরে ঘুমিয়ে পড়ল। সকালে ঘুম থেকে উঠে জল খাবার খেয়ে বন্ধুর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ি চলে এল। ধীরে ধীরে সে ধনী হয়ে গেল। তার বন্ধু কথা বলা পাথর নিয়ে কিছুই পেল না। ধীরে ধীরে ধন সম্পত্তি হারিয়ে আগে যেমন ছিল তেমনি হয়ে গেল।

এই লোককথাটিকে যদি টাইপ-মোটিফ ইনডেক্স অনুযায়ী বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে এর টাইপ-মোটিফ হবে নিম্নরূপ—

ক. টাইপ : ৭৩৬ ভাগ্য ও সম্পদ

খ. মোটিফ : ডি ৫০ প্রার্থনা

এ ৪৩৫.১ নদীর দেবী

ডি ৮১১ দেবতার কাছ থেকে জাদুবস্তু পাওয়া

ডি ৮৬০ জাদুবস্তু হারানো

ডি ৮৮০ জাদুবস্তু ফেরৎ পাওয়া

ডি ১৬১৪ জাদুকথা বলা বস্তু

ডি ১৬৭৩ ভাগ্য পরিবর্তনকারী পাথর

'কথা বলা পাথর' এটি একটি নীতিকথামূলক লোককথা। এই লোককথা থেকে বোঝা যায় যে ধিমাল সমাজের মধ্যে দুই (সৎ ও অসৎ) শ্রেণির লোকেরাই রয়েছে। ধিমালদের মধ্যে সর্বপ্রাণবাদের ধারণা অর্থাৎ জড়বস্তুর মধ্যেও যে প্রাণের অস্তিত্ব আছে সেই আদিম ধারণা যেমন আছে তেমনি যাদুবিশ্বাসেরও প্রভাব আছে। তাছাড়া অসৎ মানুষের যে কোন ভালো হতে পারে না সেই কথাটিই এই লোককথার মধ্যে দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে।

এনং পাণ্ঠা মেছাকো কাথা

(একটি পাঁঠার গল্প)

এক গ্রামে এক বৃদ্ধের তিন ছেলে ছিল। একদিন শীতের সন্ধ্যায় আগুনের পাশে বসে শরীর গরম করার সময় বৃদ্ধ তার ছেলেদের গল্প শুনিয়ে বলল, 'বিপদ-আপদ হলে সেখানকার বড় মানুষের নাম নিতে হয়, তাহলে বিপদ থেকে সহজেই রক্ষা পাওয়া যায়।' তাদের বাড়িতে একটি পাঁঠা ছাগল ছিল সেও সেই কথাগুলি শুনতে পেল। একদিন পাঁঠাটি ছাগলের দলের সঙ্গে জঙ্গলে ঘাস খেতে গিয়েছিল, খেতে খেতে একসময় পাঁঠাটি গভীর জঙ্গলে ঢুকে রাস্তা হারিয়ে ফেলে। জঙ্গলের বাঘরা পাঁঠাটাকে দেখে হঠাৎ ভীত হয়ে গেল। তারা ভাবল এটা আবার কোন প্রাণী রে? আগে তো কখনো দেখিনি জঙ্গলে। পাঁঠাটিও বাঘের সামনে পড়ে মনে মনে বলল, 'আজ আমার রক্ষা নেই, কি করব এখন?' ভাবতে ভাবতে হঠাৎ বৃদ্ধের কথা মনে পড়ল তার বিপদ আপদ হলে সেখানকার বড় মানুষের নাম নিতে হয়, তাহলে বিপদ থেকে সহজেই রক্ষা পাওয়া যায়। বাঘগুলি তাকে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি কে? কি জন্য এখানে এসেছ?' পাঁঠা জানত জঙ্গলের রাজা তো সিংহ তাই প্রাণের আশা ত্যাগ করেই ভয়ে ভয়ে বলল—

'আমাকে চিনতে পারলে না, আমি সিংহের মামা, আমি তাকে দেখতে এসেছি। এই কথা শুনে বাঘেরা বলল, 'আমাদের রাজার মামা। মামা আমাদের নমস্কার গ্রহণ করুন। আর চলুন তাহলে আমরা আপনাকে রাজার বাড়ি পৌঁছে দিয়ে আসি। পাঁঠা কোন উপায় না পেয়ে 'যা হবার হবে' বলে বাঘেদের সঙ্গে সিংহের কাছে দেখা করতে গেল। বাঘেরা সিংহের কাছে এসে বলল, 'মহারাজ দেখুন তো কে এলো আপনার সঙ্গে দেখা করতে, চিনতে পারছেন কিনা? আপনার মামা।' কিছুক্ষণের মধ্যেই সিংহ ব্যাপারটা বুঝতে পারল তাই সে মনে মনে ভাবতে লাগল এখন আমি আমার মামা না বলে পাঁঠা ছাগল বললে এখনই এর জীবন শেষ হয়ে যাবে, আমার কথা বলেছে সে বাঁচার জন্য। তাই বাঘেদের সামনে বলল, 'নমস্কার মামা এতদিন পরে তোমার ভাগ্নের কথা মনে পড়ল।' পাঁঠাও ভয়ে ভয়ে নম্র ভাবে বলল, 'আসতে চাইলেও সময় পাচ্ছিলাম না ভাগ্নে।' এরপর বাঘেদের সঙ্গে জঙ্গলে থাকতে থাকতে ঘাস খাওয়ার সুযোগ না পেয়ে দিন দিন সে দুর্বল হয়ে পড়ে। সিংহ বুঝতে পেরে একদিন বলল, 'মামা তুমি কেন ঘাস খাচ্ছ না? কি হল তোমার? পাঁঠাটি উত্তরে জানাল, 'কিছুই না ভাগ্না, অনেকদিন হয়ে গেল, বাড়ি যেতে ইচ্ছে করছে।

শুনে ঠিক আছে বলে বাঘদের বলল- 'বাঘেরা আমার মামাকে জঙ্গলের বাইরে বের করে গ্রামের ধার পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে এসো।' বাঘেরা বলল, 'ঠিক আছে রাজামশাই।' তারপর পাঁঠাটিকে মাঝখানে রেখে আগে পিছে বাঘের দল সতর্ক পাহারায় গ্রামের কাছে এসে পৌঁছাল। গ্রামের মানুষ ভয়ে ও অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল বাঘ ও পাঁঠার দিকে। পাঁঠা তখন বাঘেদের বলল, তোমরা যাও আমি এখন একাই যেতে পারব। শুনে বাঘেরা জঙ্গলে চলে গেল। বৃদ্ধের কথা শুনে মনে রেখেছিল বলেই বিপদ থেকে বেঁচে গেল।

এই লোককথাটিকে যদি টাইপ-মোটিফ ইনডেক্স অনুযায়ী বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে এর টাইপ-মোটিফ হবে নিম্নরূপ—

ক. টাইপ : ৯১০ ক অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জ্ঞান

খ. মোটিফ : বি ২৪০.৪ পশুরাজ সিংহ

'একটি পাঁঠার গল্প' এটি একটি নীতিশিক্ষামূলক লোককথা। একটি কৃষিজীবী গৃহস্থ পরিবারের কথা এখানে ফুটে উঠেছে। শারীরিক শক্তি নয়, বুদ্ধির জোরেই যে ভয়ঙ্কর বিপদ থেকে বেঁচে ফেরা যায় তারই কথা এই গল্পে ছাগলের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে। অর্থাৎ বল নয় বুদ্ধিই যে শ্রেষ্ঠ সেই সত্যটিই এখানে প্রকাশ পেয়েছে।

পশু গেলাইকো কাথা বুঝিকা রাজা

(পশুর কথা বুঝতে পারা রাজা)

এক ধর্মশীল রাজা ছিল। সে হঠাৎ একদিন ঘুমিয়ে স্বপ্নে দেখল, ভগবান তাকে আশীর্বাদ করল আর বলল, 'আজ থেকে তুমি পশু-পাখির কথা বুঝতে পারবে। কিন্তু একথা কাউকে বলবে না। বললে তোমার মৃত্যু হবে।' সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে দেখল সত্যিই সে পাখি, কুকুর, গরু সবার কথা বুঝতে পারছে। একদিন ভাত খাওয়ার সময় দেখল দুটি পিঁপড়ে লড়াই করছে। একটি পিঁপড়ে বলছে, 'আমি এই ভাত পেয়েছি, তুমি অন্য খোঁজ। দূর থেকে আমি নিয়ে এসেছি আর তুমি এতে চোখ দিলে। না আমি কিছুতেই দেব না।' তখন দুটি পিঁপড়ে ভাতটিকে ধরে টানাটানি শুরু করল। কেউ ছাড়ছে না; এমন সময় বড়ো একটি কালো পিঁপড়ে এসে বলল, 'এই ভাত

ছেড়ে দাও এটা আমার ভাত।' ভয়ে দু'টি পিঁপড়েই ছেড়ে দিল। আর বড় পিঁপড়েটি ভাতটি নিয়ে চলে গেল। রাজা এটা দেখে হাসল আর মনে মনে বলল, 'সব জায়গায় বাঁচার জন্য লড়াই হচ্ছে। দুর্বলদের ধমকিয়ে রাখছে সবলেরা।' এটা রানি দেখল এবং রাজাকে বলল, 'মহারাজ ভাত খাওয়ার সময় হাসছো কেন?' মহারাজ বলল, 'কিছু নয়। তোমাকে শুনতে হবে না। তোমাকে শোনালে আমার বিপদ হবে।' রানি বলল, 'কি এমন কথা বললে তোমার বিপদ হবে। জানি, তুমি অন্য রানির কথা বলছ। তার কথা তোমার মনে পড়ল তাই তুমি হাসছো আর বলছ ঐ কথা বললে তোমার বিপদ হবে।' মহারাজ শুনে বলল, 'কি বলছ তুমি? তুমি আমার মুখ্য রানি, তোমার চেয়ে আর আমি কাকে বেশি ভালোবাসি? মনের সব কথা খুলে তোমাকে বলি। সবচেয়ে বেশি তোমাকে বিশ্বাস করি। আর তুমি আমাকে বিশ্বাস করছ না।' রানি বলল, 'পুরুষ মানুষের বিশ্বাস নেই; সুন্দর রাজকুমারী দেখলেই বিয়ে করে বস। তোমাদের মনে কি আছে আমরা জানি না?' মহারাজ বলল, 'তুমি যা ভাবছ তা নয়। এটা ভালো কথা— এই কথা আমি কাউকেই বলতে পারব না, বললে আমি মারা যাব। আমি মরলে কি তোমার ভালো হবে?' রানি কিছুতেই মহারাজের কথা বিশ্বাস করল না; সে বলল, 'কথা বললে মানুষ মরে মহারাজ- এটা আর আমাকে বোঝাতে হবে না।' তখন মহারাজ ও রানির মধ্যে রাগারাগি হল। রানি মহারাজের সঙ্গে ভালো করে কথা বলে না। মহারাজ কিছু বললেই রানির সেই একই প্রশ্ন 'তুমি হাসছিলে কেন? আগে বল।' মহারাজের মন খারাপ হয়ে গেল তখন সে মনে মনে বলল, আমি এই কথা বলে মরবো। রানি দেখুক আমি সত্যিই বলছি। তখন একদিন মহারাজ রানিকে বলল, 'তুমি কথাটি শুনতে চাও তো ঠিক আছে আমাদের মাঠের জমিতে একটি বড় পুকুর খুঁড়তে বলেছি; ওই পুকুর হয়ে গেলে তখন আমি তোমাকে ওই কথা বলবো। আমি মরে গেলে ওই পুকুরে কবর দেবে।' তবুও রানি বলল, 'তোমার কথা কখনো সত্যি হবে না। তুমি আমাকে মিথ্যে কথা বলছ।' মাটি খুঁড়ে পুকুর তৈরি করা হল। মন্ত্রী বলল, 'মহারাজ আমাদের পুকুর তৈরির কাজ শেষ। এখন কি করতে হবে?' মহারাজ বলল, 'মন্ত্রী আমি আজ একটি কথা রানিকে বলব এবং ওই কথা বলেই আমি মারা যাব। তখন আমাকে ওই পুকুরে কবর দিয়ো।' শুনে মন্ত্রী বলল, 'তাহলে কেন ওই কথা বলবেন; আপনি মরে গেলে আমাদের প্রজাদের কি দশা হবে আপনার জানা আছে?' রাজা বলল, 'রানি এক সপ্তাহ থেকে রেগে আছে ও এই কথা শুনবেই। আমি বলছি এই কথা বললে আমি মরে যাব তবুও সে কিছুতেই মানছে না।' মন্ত্রী শুনে বলল, 'আমি রানিকে বোঝাব।' মন্ত্রী রানিমাকে গিয়ে বলল, 'তুমি একি

করছ? মহারাজ এই কথা বললে মারা যাবে, একথা আপনি না শুনলে সবার মঙ্গল হবে।' একথা শুনে রানিমা রেগে মন্ত্রীকে বলল, 'এই বিদ্যা বুদ্ধিতে তুমি মন্ত্রী হয়েছ, কথা বললে মানুষ মারা যায় একথা তুমি আগে কখনো শুনেছ কি? আসলে তার উপপত্নী আছে তাই সে বলতে ভয় পায়। এই ছোট্ট সহজ কথা তুমি বুঝলে না।' তখন মন্ত্রী মন খারাপ করে গিয়ে রাজাকে বলল, 'অনেক বোঝালাম, রানিমা কিছুতেই বুঝলেন না।' তখন রাজা মন্ত্রীকে কিভাবে রাজ্য চালাবে, প্রজাদের জন্য কি কি করবে বলতে বলতে পুকুরের দিকে যাচ্ছিল এমন সময় এক শিয়াল ও শিয়ালনীকে দেখতে পেল রাজা। শিয়ালনী ছিল গর্ভবতী। সে শিয়ালকে বলছে, 'ওগো আমার না একটি খাবার খেতে ইচ্ছে করছে, খাওয়াতে পারবে?' শিয়াল বলল, 'কি খেতে ইচ্ছে হচ্ছে বল। আমার সাধ্যের মধ্যে থাকলে এনে দেব।' তখন শিয়ালনী পাশে থাকা ষাঁড় দেখিয়ে বলল, 'ওর ওই দুটি বড় বড় অন্ডকোষ খেলে আমার মন শান্তি হয়।' শিয়াল বলল, 'তুমি আমাকে কি বোকা রাজা পেয়েছ? দেখো এই রাজা রানির কথায় মরতে পুকুরে যাচ্ছে। রানিকে তার কথা বলবে আর রাজা মারা যাবে। রানি আবার অন্য রাজাকে বিয়ে করে নেবে। এই বোকা রাজা রানিকে তিন-চার লাঠি লাগিয়ে দিলে ঠিক হত। রানি নিজেই বলতো আর আমি ওই কথা শুনব না। রাজা বলছে ওই কথা বললে সে মারা যাবে তবুও তাকে শুনতেই হবে। কেমন রানি সে রাজার জীবন নিতে চায়। রাজাও মরার জন্য ওই রানিকে বলতে যাচ্ছে। আমি ওই রাজার মত বোকা নই। তোমার জন্য আমি অন্ডকোষ আনতে যাব আর ষাঁড় গরুর লাথি খেয়ে মারা পড়বো। আমি মারা যাব আর তুমি অন্য শিয়ালের সঙ্গে ঘুরে বেড়াবে। এই লাঠি দেখছ এই লাঠি দিয়ে তোমার মাথা ফাটাব।' শিয়ালকে রাগতে দেখে শিয়ালনী বলল, 'এমনি বলছিলাম আর তাতেই তুমি সত্যি ভাবলে। রাগ কর না সোনা।' এই কথা শুনে রাজা ফিক করে হেসে মনে মনে বলল, রানি আমি মরলে তোমার ভালো হবে তাই না? তুমি অন্য রাজাকে পাবে। তোমার আশা আর পূর্ণ হবে না বলেই সে মন্ত্রীকে বলল, 'সৈন্যদের বল রানিকে বন্দী করতে। এ আমার রানি নয়, আমাকে মারতে চায়।' মহারাজের রাগ দেখে রানি তার পায়ে এসে পড়ল, বলল, 'আমাকে ক্ষমা কর। আমার ভুল হয়ে গেছে, কি শাস্তি দেবে দাও' বলে হাউ-মাউ করে কাঁদতে লাগল। তখন মহারাজ রানিকে ধরে বলল, 'তোমার কান্না দেখে বুঝলাম তোমার মন থেকে পাপ চলে গেছে।' সবাই খুশি হল প্রিয় রাজার জন্য। সবাই মহারাজ ও রানির জয়ধ্বনি করতে থাকল। আবার মহারাজ ও রানির জীবনে শান্তি ফিরে এল।

এই লোককথাটিকে যদি টাইপ-মোটিফ ইনডেক্স অনুযায়ী বিশ্লেষণ করা যায় তাহলে এর টাইপ-মোটিফ হবে নিম্নরূপ—

ক. টাইপ : ৬৭০ (ক) জীবজন্তুর ভাষা শুনে শয়তান স্ত্রীকে সায়েস্তা করা।

খ. মোটিফ : বি ১২০.২ বুদ্ধিমান শেয়াল

সি ৪২৫ নিষেধাজ্ঞা : পশুর ভাষা জানা জ্ঞান প্রকাশ করা

ডি ১৮১৪.২ স্বপ্নের মাধ্যমে উপদেশ

'পশুর কথা বুঝতে পারা রাজা' এই লোককথাটির মধ্যে দেখানো হয়েছে যে ধিমালরা অলৌকিকতায় বিশ্বাসী। তাছাড়া শক্তিমানেরা সবসময় যে দুর্বলদের শোষণ করে চলেছে সেই দিকটিও প্রকাশ পেয়েছে একটি বড় পিঁপড়ের খাবার নিয়ে যাওয়ার মধ্যে দিয়ে। আসলে আদিমকাল থেকেই মানুষকে তাদের প্রাথমিক চাহিদা মেটানোর জন্য সংগ্রাম করতে হয়েছে। আজও সেই সংগ্রাম করে চলেছে, শুধু রূপের পরিবর্তন হয়েছে। তাছাড়া ধিমাল সমাজের নারীমনস্তত্ত্বের জটিল দিকটিও ফুটে উঠেছে এই লোককথাটির মধ্যে দিয়ে।

তথ্যসূত্র গ্রন্থ

১। চট্টোপাধ্যায়, তুষার। 'লোকসংস্কৃতির তত্ত্বরূপ ও স্বরূপ সন্ধান' এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোম্পানী প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, ২০০২, পৃ : ৪৭।

২। ইসলাম, শেখ মকবুল। 'লোকসংস্কৃতিবিজ্ঞান তত্ত্ব, পদ্ধতি ও প্রয়োগ' বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা ২০০১, পৃ: ৯৯।

৩। Dundes, Alan. 'Who are the Folk' Indian University press, 1980, page-6.

৪। ইসলাম, ডক্টর মযহারুল। 'ফোকলোর পরিচিতি ও পঠন-পাঠন' অবসর প্রকাশনা সংস্থা, ঢাকা, ২০১২, পৃ : ১২।

৫। শর্মা, নবীনচন্দ্র। 'অসমীয়া লোকসংস্কৃতির আভাস' বাণী প্রকাশ প্রাইভেট লিমিটেড, গুয়াহাটি, ১৯৯৫, পৃ : ৫১।

৬। চক্রবর্তী, ড. বরুণকুমার (সম্পাদিত)। 'বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতিকোষ' অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা, ২০০৭, পৃ : ৪৯৪।

৭। চক্রবর্তী, বরুণকুমার। 'লোকঔষধ ও লোকচিকিৎসা' পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০৩, পৃ : ১।

৮। চক্রবর্তী, বরুণকুমার ও বন্দোপাধ্যায়, সুমহান (সম্পাদিত)। 'লোকসংস্কৃতি ও নৃবিদ্যার অভিধান' অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা, ২০০৮, পৃ : ২০৪-২০৫।

৯। ভট্টাচার্য, মালিনী ও ঘোষ, প্রদীপ (সম্পাদিত)। 'জেলা লোকসংস্কৃতি পরিচয় গ্রন্থ মেদিনীপুর' লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২০০২, পৃ : ৩১২।

১০। চক্রবর্তী, ড. বরুণকুমার (সম্পাদিত)। 'বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতিকোষ' অপর্ণা বুক ডিস্ট্রিবিউটার্স, কলকাতা, ২০০৭, পৃ : ৫১১।

১১। Hodgson, Brian Houghton. 'Miscellaneous Essays Relating to Indian Subjects' (Vol-1), Asian Educational Services, New Delhi, 1992, page-147.

১২। ভট্টাচার্য, আশুতোষ। 'বাংলার লোকসাহিত্য' (প্রথম খন্ড), ক্যালকাটা বুক হাউস, কলিকাতা, ১৯৭৩, পৃ : ২৫৬।

১৩। রায়, বিশ্বজিৎ। 'ধিমাল জাতি ও তার সংস্কৃতি' অপ্রকাশিত গ্রন্থ, পৃ : ৩২।

১৪। ভট্টাচার্য, আশুতোষ। 'বাংলার লোকসাহিত্য' (প্রথম খন্ড), ক্যালকাটা বুক হাউস, কলিকাতা, ১৯৭৩, পৃ : ৫৬১-৫৬২।

উপরিউক্ত তথ্যসূত্র ছাড়াও ক্ষেত্রসমীক্ষার মাধ্যমে যাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে অভিসন্দর্ভের বিষয় অনুসারে তাদের পরিচয় নীচে দেওয়া হল—

■ **লোকখাদ্য ও লোকপানীয়**

১. গর্জন কুমার মল্লিক, বয়স -৫৪, গ্রাম- কেটুগাবুর জোত-২, জেলা- দার্জিলিং, পেশা-শিক্ষক, শিক্ষা- স্নাতক, সংগ্রহের তারিখ- ০২.০৪.২০১৩।

২. অলকা মল্লিক, বয়স- ৪৮, গ্রাম- কেটুগাবুর জোত-২, জেলা- দার্জিলিং, পেশা- গৃহবধূ, শিক্ষা- অষ্টম শ্রেণি, সংগ্রহের তারিখ- ২৯.০৬.২০১২।

৩. বাংঠু মল্লিক, বয়স- ৭৩, গ্রাম- গোলদাস জোত, জেলা-দার্জিলিং, পেশা- কৃষিকাজ, শিক্ষা-নিরক্ষর, সংগ্রহের তারিখ- ২০.১০.২০১৪।

■ **লোকঔষধ**

১. দুর্জন মল্লিক, বয়স- ৬০, গ্রাম- কেটুগাবুর জোত- ২, জেলা- দার্জিলিং, পেশা- ওঝা, শিক্ষা- চতুর্থ শ্রেণি, সংগ্রহের তারিখ- ০৬.০১.২০১৪।

২. রইঞ্চা মল্লিক, বয়স- ৬৬, গ্রাম- কেটুগাবুর জোত- ২, জেলা- দার্জিলিং, পেশা- ওঝা, শিক্ষা- দ্বিতীয় শ্রেণি, সংগ্রহের তারিখ- ০৭.০৫.২০১২।

৩. বিকাশ মল্লিক, বয়স- ৬২, গ্রাম- কেটুগাবুর জোত- ১, জেলা- দার্জিলিং, পেশা- কৃষিকাজ, শিক্ষা- নিরক্ষর, সংগ্রহের তারিখ- ২৭.১২.২০১৩।

■ **লোকপরিচ্ছদ ও অলংকার**

১. সটমেন মল্লিক, বয়স- ৬৬, গ্রাম- গোলদাস জোত, জেলা- দার্জিলিং, পেশা- কৃষিকাজ, শিক্ষা- নিরক্ষর, সংগ্রহের তারিখ- ০৬.০১.২০১৪।

২. অলকা মল্লিক, বয়স- ৪৮, গ্রাম- কেটুগাবুর জোত-২, জেলা- দার্জিলিং, পেশা- গৃহবধূ, শিক্ষা- অষ্টম শ্রেণি, সংগ্রহের তারিখ- ২৯.০৬.২০১২।

৩. দীপক মল্লিক, বয়স- ১৯, গ্রাম-মৌরি জোত, জেলা- দার্জিলিং, শিক্ষা- স্নাতক প্রথমবর্ষে পাঠরত, সংগ্রহের তারিখ- ২৭.১২.২০১৪।

■ **লোক তৈজস**

১. অলকা মল্লিক, বয়স- ৪৮, গ্রাম- কেটুগাবুর জোত-২, জেলা- দার্জিলিং, পেশা- গৃহবধূ, শিক্ষা- অষ্টম শ্রেণি, সংগ্রহের তারিখ- ২৯.০৬.২০১২।

২. তিনিয়া মল্লিক, বয়স- ৩৮, গ্রাম- সদামল্লিক জোত, জেলা- দার্জিলিং, পেশা- গৃহবধূ, শিক্ষা- নিরক্ষর, সংগ্রহের তারিখ- ১০.০২.২০১৫।

৩. বাণীসরী মল্লিক, বয়স- ৬০, গ্রাম- মৌরি জোত, জেলা- দার্জিলিং, পেশা- গৃহবধূ, শিক্ষা- নিরক্ষর, সংগ্রহের তারিখ- ২৭.১২.২০১৩।

■ **লোক অস্ত্র**

১. কিষ্ট মল্লিক, বয়স- ৬৫, গ্রাম- শিউবর জোত, জেলা- দার্জিলিং, পেশা- ওঝা, শিক্ষা- নিরক্ষর, সংগ্রহের তারিখ- ০৩.০৭.২০১২।

২. মোটে মল্লিক, বয়স- ৩২, গ্রাম- কেটুগাবুর জোত-২, জেলা- দার্জিলিং, পেশা- শ্রমিক, শিক্ষা- তৃতীয় শ্রেণি, সংগ্রহের তারিখ- ১৮.০৩.২০১৫।

৩. বুধাই মল্লিক, বয়স- ৬০, গ্রাম- কেটুগাবুর জোত-১, জেলা- দার্জিলিং, পেশা- কৃষিকাজ, শিক্ষা- নিরক্ষর, সংগ্রহের তারিখ- ১৩.০৫.২০১৪।

■ **লোকযন্ত্র**

১. রতন মল্লিক, বয়স- ৪৭, গ্রাম- মৌরি জোত, জেলা- দার্জিলিং, পেশা- কৃষিকাজ, শিক্ষা- চতুর্থ শ্রেণি, সংগ্রহের তারিখ- ২৭.১২.২০১৩।

২. রুপেজ মল্লিক, বয়স- ১৮, গ্রাম- মৌরি জোত, জেলা- দার্জিলিং, শিক্ষা- নবম শ্রেণি পাঠরত, সংগ্রহের তারিখ- ২৭.১২.২০১৩।

৩. হরদেব মল্লিক, বয়স- ৩০, গ্রাম- কেটুগাবুর জোত-২, জেলা- দার্জিলিং, পেশা- কৃষিকাজ, শিক্ষা- সপ্তম শ্রেণি, সংগ্রহের তারিখ- ২৭.১২.২০১৩।

■ **লোকবাসগৃহ**

১. ধনী মল্লিক, বয়স- ৭৪, গ্রাম- মৌরি জোত, জেলা- দার্জিলিং, পেশা- কৃষিকাজ, শিক্ষা- নিরক্ষর, সংগ্রহের তারিখ- ০২.০৪.২০১৩।

২. সাতানু মল্লিক, বয়স- ৬৪, গ্রাম- ঝাপু জোত, জেলা- দার্জিলিং, পেশা- কৃষিকাজ, শিক্ষা- নিরক্ষর, সংগ্রহের তারিখ- ২০.১০.২০১৪।

৩. অলকা মল্লিক, বয়স- ৪৮, গ্রাম- কেটুগাবুর জোত-২, জেলা- দার্জিলিং, পেশা- গৃহবধূ, শিক্ষা- অষ্টম শ্রেণি, সংগ্রহের তারিখ- ২৯.০৬.২০১২।

■ **লোকসঙ্গীত**

১. গর্জন কুমার মল্লিক, বয়স -৫৪, গ্রাম- কেটুগাবুর জোত-২, জেলা- দার্জিলিং, পেশা-শিক্ষক, শিক্ষা- স্নাতক, সংগ্রহের তারিখ- ০২.০৪.২০১৩।

২. ববিতা মল্লিক, বয়স- ২৬, গ্রাম- কেটুগাবুর জোত-২, জেলা- দার্জিলিং, পেশা-শিক্ষকা, শিক্ষা- মাধ্যমিক উত্তীর্ণ, সংগ্রহের তারিখ- ১৪.১০.২০১৪।

৩. তন্ময়ী মল্লিক, বয়স-১২, গ্রাম- কেটুগাবুর জোত-২, জেলা- দার্জিলিং, শিক্ষা- অষ্টম শ্রেণি, সংগ্রহের তারিখ- ০২.০৪.২০১৫।

৪. মনিষা মল্লিক, বয়স- ১৩, গ্রাম- কেটুগাবুর জোত-২, জেলা- দার্জিলিং, শিক্ষা- নবম শ্রেণি, সংগ্রহের তারিখ- ১২.০৫.২০১৪।

■ **ধাঁধা**

১. বিষ্টু মল্লিক, বয়স- ৪৮, গ্রাম- কেটুগাবুর জোত-২, জেলা- দার্জিলিং, পেশা- শ্রমিক, শিক্ষা- নিরক্ষর, সংগ্রহের তারিখ- ১৭.০৬.২০১৩।

২. মাসোর মল্লিক, বয়স - ৭০, গ্রাম- কেটুগাবুর জোত-২, জেলা- দার্জিলিং, পেশা- শ্রমিক, শিক্ষা- নিরক্ষর, সংগ্রহের তারিখ- ১৭.০৬.২০১৩।

৩. গর্জন কুমার মল্লিক, বয়স -৫৪, গ্রাম- কেটুগাবুর জোত-২, জেলা- দার্জিলিং, পেশা-শিক্ষক, শিক্ষা- স্নাতক, সংগ্রহের তারিখ- ০২.০৪.২০১৩।

৪. দীপক মল্লিক, বয়স- ১৯, গ্রাম-মৌরি জোত, জেলা- দার্জিলিং, শিক্ষা- স্নাতক প্রথমবর্ষে পাঠরত, সংগ্রহের তারিখ- ২৭.১২.২০১৪।

■ **লোককথা**

১. গর্জন কুমার মল্লিক, বয়স -৫৪, গ্রাম- কেটুগাবুর জোত-২, জেলা- দার্জিলিং, পেশা-শিক্ষক, শিক্ষা- স্নাতক, সংগ্রহের তারিখ- ০২.০৪.২০১৩।

২. কেষ্ট মল্লিক, বয়স -৬২, গ্রাম- কেটুগাবুর জোত-১, জেলা- দার্জিলিং, পেশা- কৃষিকাজ, শিক্ষা- নিরক্ষর, সংগ্রহের তারিখ- ২১.০৬.২০১৩।

৩. মাসোর মল্লিক, বয়স - ৭০, গ্রাম- কেটুগাবুর জোত-২, জেলা- দার্জিলিং, পেশা- শ্রমিক, শিক্ষা- নিরক্ষর, সংগ্রহের তারিখ- ১৭.০৬.২০১৩।

৪. ধনী মল্লিক, বয়স- ৭৪, গ্রাম- মৌরি জোত, জেলা- দার্জিলিং, পেশা- কৃষিকাজ, শিক্ষা- নিরক্ষর, সংগ্রহের তারিখ- ০২.০৪.২০১৩।

৫. বিকাশ মল্লিক, বয়স- ৬২, গ্রাম- কেটুগাবুর জোত- ১, জেলা- দার্জিলিং, পেশা- কৃষিকাজ, শিক্ষা- নিরক্ষর, সংগ্রহের তারিখ- ২৭.১২.২০১৩।

৬. বাণীসরী মল্লিক, বয়স- ৬০, গ্রাম- মৌরি জোত, জেলা- দার্জিলিং, পেশা- গৃহবধূ, শিক্ষা- নিরক্ষর, সংগ্রহের তারিখ- ২৭.১২.২০১৩।